উপন্যাস

তারপর কী হল

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

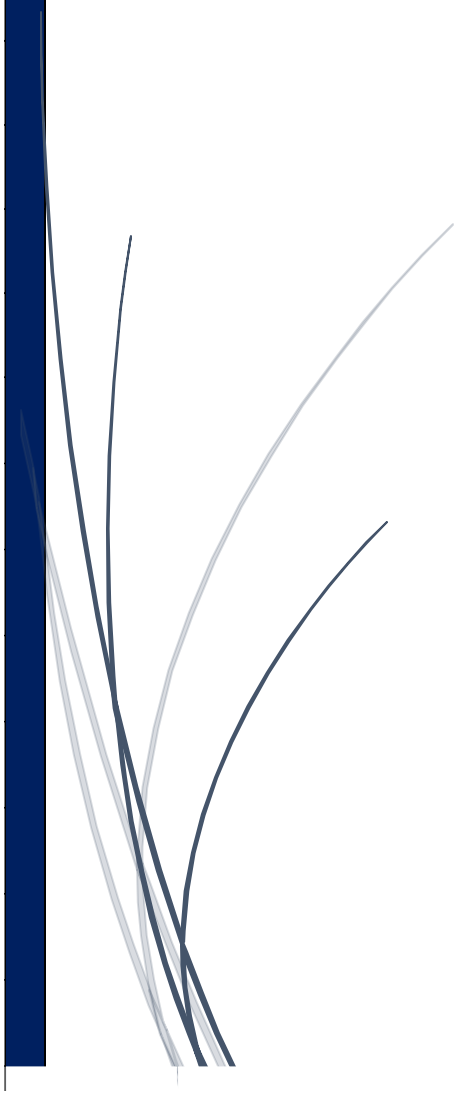

BENGALIEBOOK.COM
2021
বেঙ্গালিইবুক.কম
bengaliebook.com

সূচিপত্র

প্রথম পর্ব 2
১.১ 2
১.২ 13
১.৩ 30
১.৪ 54
দ্বিতীয় পর্ব 64
২.১ 64
২.২ 79
২.৩ 91
২.৪ 106
২.৫ 122

প্রথম পর্ব

১. ১

তারপর?

তারপর আমি চক্ষু মেলে দেখি, কেমন যেন নতুন-নতুন রাস্তা, হুস-হুঁস করে পাশ দিয়ে বড়-বড় গাড়ি যায়, একটা খুব উঁচু গাড়ির মধ্যে দেখি, ঘোড়া ছয়-সাতটা, না, নয়-দশটা ঘোড়া। আর একটা ভ্যান ভরতি কলা, কঁচা কলা, হইলদা না।

জায়গাটা কোথায়?

তা তো জানি না।

সেখানে তুমি গেলে কী ভাবে?

তাও জানি না। ঘুমাইয়া আছিলাম, কতক্ষণ ঘুমাইছি কে জানে। জেগে উঠে দেখি একটা টেক্সির মধ্যে, আমার হাত বান্ধা, মুখও বান্ধা। দুইটা লোক দুই পাশে বসে আছে।

ঘুমিয়ে পড়েছিলে? কোথায় ঘুমোলে? তার আগে কী করছিলে?

তার আগে, তার আগে সাফলদির সঙ্গে সাঁতরাগাছি যাচ্ছিলাম।

সাফলদি কে? ছেলে না মেয়ে?

সাফলদি গোলাপির এক পিসি। আপন না, দূর সম্পর্কের। নার্সের কাজ করে, ঘুইরা ঘুইরা বেড়ায়। মাঝে-মাঝে গেরামে আসে।

সাফলদি, অদ্ভুত নাম। নার্সের কাজ করে। ঘুরে-ঘুরে বেড়ায়। ইন্টারেস্টিং। তার সঙ্গে সাঁতরাগাছি যাচ্ছিলে কেন?

সাঁতরাগাছিতে গাজনের মেলা হয়। তিন দিন। খুব বড় মেলা হয়, হাতির পিঠে চেপে শিবঠাকুর আসে। গোলাপি যাবে সাফলদির সঙ্গে। আমারেও জিজ্ঞাসা করল, যাবি, যাবি? আমিও নেচে উঠলাম। কতদিন মেলা দেখি নাই।

তোমার স্বামী আছে তো? সে তোমাকে যেতে দিতে রাজি হল?

সে বলল, যাও, ইচ্ছা যখন হয়েছে তো যাও। আমি কিন্তু পয়সাকড়ি কিছু দিতে পারব না। আমার তো নিজের একটাও পয়সা নাই, বাসের টিকিট, রেলের টিকিট কেমনে দিব? মনকে তখন বুঝাই, হায় হায়, যাওয়া হবে না। গোলাপি তখন কইল, কান্দিস না, টিকিট লাগবে না। সব সাফলদি দিবে। সাফলদি বড় ভালো মানুষ। দয়ার শরীর। তাই ঠিক হল।

তোমার তো ছেলেমেয়ে আছে? তাই না?

দুইটা। এক ছেলে, এক মেয়ে।

তাদের নাম কী?

রতন আর সরস্বতী।

তোমার নাম তো লক্ষ্মী? সত্যিই লক্ষ্মী, না অন্য কিছু? লক্ষ্মীর মেয়ের নাম সরস্বতী কী করে হয়? ওরা দুই বোন, তা জানো না?

নাম তো আমি রাখি নাই। শাশুড়ি ঠাকরুন রাখছেন।

যাই হোক, সাঁতরাগাছিতে মেলা দেখতে যাবে, তোমার ছেলেমেয়ে তাতে আপত্তি করেনি? তারা নিজেরা যাওয়ার জন্য আবদার করেনি?

ছেলে আমার খুব বুঝদার। তারে কোনও কথা একবার বললেই শোনে। মেয়ে ঘ্যানঘ্যান। করেছিল, কিন্তু গোলাপি আগেই কয়ে দিয়েছে, বাইচ্চাদের সঙ্গে লওয়া যাবে না। তখন মেয়ের বাপই বুঝাল, তোর মা তোকে মেলা থেকে পুঁতির মালা এনে দিবে। তাতেও মেয়ে বোঝে না। তখন তারে...

তার মানে, তোমার স্বামী তোমাকে যেতে দিতে রাজি, ছেলেমেয়েও মেনে নিল, আর তোমার শাশুড়ি? আসলে শাশুড়িই তো অনুমতি দেয়।

শাশুড়ি হ্যাঁ-না কিছুই বলেন নাই।

শুধু আমার মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়েছিলেন।

শাশুড়ি মানুষ কেমন?

ভালোও বটে, মন্দও বটে। যেমন হয়। কোনওদিন আমার নাম ধরে ডাকেন নাই। প্রথম থেকেই বলতেন, বেটি। মাঝে-মাঝে চড়-চাপড় মারতেন, হপ্তায় দুই-তিন দিন রাত্তিরে খেতে দিতেন না। তবে এ কথাও না স্বীকার করলে আমার পাপ হবে, শাশুড়ি মা মাঝে-মাঝে নরম সুরেও কথা কইতেন। সন্ধেবেলা বলতেন, আয় বেটি, তোর চুল বেন্ধে দিই। সেই সময় হঠাৎ হঠাৎ তিনি ফুপায়ে-ফুপায়ে কেন্দে উঠতেন।

কেঁদে উঠতেন? কেন?

তা জানি না। কোনওদিন কিছু বলেন নাই।

তারপর কী হল? তুমি গাজনের মেলায় গেলে?

না, যাই নাই।

যাওয়া হল না?

কপালে নাই। যাব কী করে?

গাজনের মেলায় যেতে কপাল লাগে? বেশ। বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলে গোলাপির সঙ্গে?

গোলাপি আমাকে নিয়া গেল সাফলদির কাছে। সোনারপুর পর্যন্ত হেঁটে গিয়ে আমরা ট্রেনে উঠে বসলাম।

তখন কটা বাজে?

তা জানি না, তবে বিকাল হয় নাই। গাছের ছায়া কালীমন্দিরের দিকে ছিল। পুকুরের জলে রোদ্দুর চমকাচ্ছিল। ট্রেন থেকে নামলাম শিয়ালদায়। উরিবাস কত বড় এস্টেশান।

তুমি শিয়ালদায় আগে কখনও আসনি?

নাঃ! খুব ছোটবেলায় বোধহয়, নাঃ, তাও মনে নাই। কে আমাকে নিয়া যাবে? চতুর্দিকে কত মানুষ। সাফলদি আমার হাত ধরে ছিল, যাতে আমি হারায়ে না যাই। আবার উঠলাম একটা রেলের কামরায়।

শিয়ালদা থেকে সাঁতরাগাছির ট্রেন? সে তো হাওড়া লাইনে যেতে হয়।

হাওড়া লাইন মানে?

হাওড়া লাইন মানে হাওড়া লাইন। যাই হোক, সেইজন্যই সাঁতরাগাছির মেলা দেখতে যাওয়া হয়নি?

আমি যে ঘুমায়ে পড়লাম।

ট্রেনে ঘুমিয়ে পড়লে? সেই বিকেলবেলা?

তাই তো। জানলার ধারে বসেছিলাম, দুলে-দুলে যাচ্ছে রেলগাড়ি, কী সুন্দর, কত ধানখেত, চিলুবিলু করে বাতাস, নদীর ধারে একখান ভাঙা বাড়ি...

ঠিক আছে, ওসব বলতে হবে না। জানলার পাশে বসে তুমি ঘুমিয়ে পড়লে? সাঁতরাগাছি আর কত দুরে! তোমায় ডেকে তুলল না?

সাফলদি আমারে একটা পান খেতে দিয়েছিল। কী সুন্দর পান! ঠান্ডা ঠান্ডা, মিঠা, মিঠা, মুখে দিতে না দিতেই...

পান খেয়েছিলে? তাই বলো! সেই পানে অনেকখানি ঘুমের ওষুধ ছিল। ওল স্টোরি! ঘুম ভাঙল কখন?

ঠিক মনে নাই। রাত্তির, অনেক রাত্তির। শুনশান। কুকুর ডাকছিল।

বিকেল থেকে রাত্তির। তার মানে, সাঁতরাগাছি থেকে অনেক দূরে। সেখানে ট্রেন থেকে নামলে?

বোধহয়। কিছু দেখা যায় না। হাঁটতেও পারি না। কে যেন ধরে-ধরে নিয়ে গেল। কোথায় জানি আবার শুয়ে পড়লাম। আবার ঘুম।

কিছু খাওনি? খিদে পায়নি?

না। বুঝি নাই। এত ঘুম।

সঙ্গে আর কে-কে ছিল তখন? তোমার সেই সাফলদি, আর ওই যে গোলাপি না কে...

কিছু মনে নাই। জ্বর-ব্যাধির মতন আমারে ঘুমে ধরেছিল।

খুব কড়া ডোজ ছিল। তারপর কী হল?

আবার চোখ মেলে দেখি রোদ্দুর। খুব রোদ্দুর।

কোথায়? ট্রেনের কামরায়? না গাড়িতে?

ঘরের মধ্যে। মেঝেতে একটা চাটাই পাতা। বালিশ নাই। সামনের দেওয়ালেই একটা জানলা। চক্ষের ওপর রোদ্দুর পড়ে। ঘুম ভাঙতেই তাড়াতাড়ি উঠে পড়তে গিয়ে দেখি...

কী দেখলে? চুপ করে গেল কেন?

ছি ছি ছি ছি। সে আমি কইতে পারব না।

আমার কাছে লজ্জা করলে তো চলবে না। সব খুলে বলতে হবে। কী দেখলে ঘরের মধ্যে?

সাহেব, এক গেলাস জল খাব।

জল খাবে?

হ, বড় তেষ্টা পাইছে।

জল না পানি?

জল আর পানি তো একই।

তাই নাকি? তুমি বাড়িতে কী বলতে? তোমার ছেলেমেয়েরা জল বলে না পানি বলে?

জল বলে।

তোমরা মুসলমান নও?

কী বলেন সাহেব! আমার নাম লক্ষ্মী। ঠাকুর-দেবতার নাম কি মুসলমানের হয়? আমার মেয়ের নামও সরস্বতী। ওর সঙ্গে খেলা করে একজন, তার নাম লায়লা। আর একটা মেয়ে ভালো গান গায়, তার নাম জাহানারা। সে বলেছিল, আমাদের পূজার প্রসাদ খাইতে নাই।

হু। কিন্তু কেস ফাইলে তোমার নাম লেখা আছে সরিফন। স্বামীর নাম জলিল শেখ। বাড়ি মুনসিগঞ্জ। ছেলেমেয়ের কোনও রেকর্ড নেই।

না, না, সাহেব, এ কী বলতেছেন। আমার বাড়ি মুনসিগঞ্জ। আমার নাম লক্ষ্মী পাড়ুই। আপনারে তো আগেই বলেছি।

তা বলেছ বটে। কিন্তু অনেকেই তো বানায়। অন্য নাম বলে। তুমি সরিফন নামে কারুকে চেনো?

না।

তোমার স্বামীর নাম কী?

কইতে নাই। সোয়ামির নাম নিলে পাপ হয়। তেনার ছোট ভাইয়ের নাম বিরোজ।

বিরোজ আবার কী ধরনের নাম। হিন্দুদের এই নাম তো হয় না। ফিরোজ? তুমি হিন্দু আর তোমার স্বামীর ছোট ভাই, মানে দেওর, সে মুসলমান?

না সাহেব। সে-ও হিন্দু। বিরোজ! বিরোজ!

এ তো মহা মুশকিল হল! কোয়েশ্চেন অফ আইডেনটিটি। তবে কি আমি ভুল মেয়ের সঙ্গে কথা বলছি? তুমি যদি লক্ষ্মী হও, তা হলে সরিফন গেল কোথায়?

জানি না।

স্বামীর নাম একটা কাগজে লিখে দিতে পারো?

হা কপাল! লেখতে পড়তে শিখি নাই।

বিরোজ? বিরোজ? ক্যান ইট বি বিরাজ? দ্যাট মেস সেক্স, বিরাজ হিন্দু নাম হয়।

ঠিক বলেছেন সাহেব। বিরাজ।

যাই হোক, রোদ্দুর চোখ লাগায় তোমার ঘুম ভাঙল। তখন তুমি ঘরের মধ্যে কী দেখলে?

বলতে শরম লাগে।

লাগুক। চোখ নীচের দিকে নামিয়ে বলো।

দেখি যে ঘরের এক কোণে আর একটি মেয়ে ঘুমায়ে আছে। প্রথমে চিনি নাই। উপুড় হয়ে ছিল, আমি একবার চেয়েই চক্ষু ফিরিয়ে নিয়েছি।

কেন?

ইয়ে, মানে, কিছু ছিল না।

কিছু ছিল না, তার মানে? তুমি যে বললে..

গায়ে কিছু ছিল না। যে মেয়েমানুষটা, তখনও মুখ দেখি নাই, তার গায়ে শাড়ি, বেলাউজ, শায়া কিছুই ছিল না।

বেঁচে ছিল?

প্রথমে ভয় পেয়ে...তারপর দেখি যে শ্বাস পড়ে। আসলে অত কথা কিছু ভাবি নাই, সাহেব। এক-দুই পলক সেই মেয়েমানুষটার দিকে চেয়েই আমি নিজের দিকে, তারপরেই ভয়ে চিক্কর দিয়ে উঠেছি। আর আমি কইতে পারব না।

বুঝেছি। বুঝেছি। আর বলতে হবে না। দিস ইজ কমন প্র্যাকটিস। তোমার গায়েও একটুও সুতো ছিল না, তাই তো? শাড়ি-টাড়ি সব খুলে নিয়েছে। আর কোনও অত্যাচারের চিহ্ন ছিল?

না, সাহেব।

রক্ত-টক্ত।

না।

ঘুমের ওষুধ খাইয়ে তোমাদের দুজনের শাড়ি-টাড়ি ওরা খুলে নিয়েছে, কেন জানো? তা হলে আর দরজায় তালা দিতে হয় না, পাহারাও রাখতে হয় না। ওই অবস্থায় কোনও মেয়ে পালাতে পারবে না। জানলা খোলা ছিল বললে! জানলার বাইরে কী ছিল?

দেখি নাই। উঠে যাওয়ার সাহস হয় নাই। কী হল, কেন এমন হল, কিছুই বুঝতে পারি না। তাই কিছুক্ষণ কালাম বসে-বসে। এর মধ্যে ক্ষুধাও পেয়েছিল খুব।

খিদে তো পাবেই। রাত্তিরে কিছু খাওয়া হয়নি। কান্নার সময় বেশি খিদে পায়। অন্য মেয়েটির ঘুম ভাঙল?

জি।

জি?

জি।

তুমি যে বললে, তুমি হিন্দু? হিন্দুরা কি জি বলে না হা বলে? বাঙালরা বলে হ।

হ। আমরা হ-ও বলি, জি-ও বলি।

পিকিউলিয়ার। যাই হোক, অন্য মেয়েটি জেগে উঠল? সে কি গোলাপি?

হ। সে-ও শুরু করল কান্না। দুইজনে দুইজনারে ধরে...

টু ন্যুড লেডিজ উইপিং ইন আ স্মল রুম, নিয়ার দা উইনডো। দা রুম ইজ ডার্ক, ব্রাইট সানলাইট আউটসাইড। এই হচ্ছে দৃশ্যটি। কতক্ষণ কাঁদলে? দশ-পনেরো মিনিট, তার

বেশি সময় কান্না থাকে না। তবে ওই দশ-পনেরো মিনিটকেই অনেকক্ষণ মনে হয়। দেন হোয়াট? তারপর কী হল?

দরজা ঠ্যালে ঢুকল একজন।

মেয়ে না পুরুষ?

পুরুষ!

তোমরা দুজনেই তখন লজ্জা আর লুকোবে কোথায়? দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে রইলে, তাই না? মেয়েরা সাধারণত এরকমই করে। সাদা দেওয়ালকেই ভরসাস্থল মনে হয়। দেওয়ালটা সাদা ছিল?

সাদা, না ঠিক সাদা না। একটু হইলদা, হইলদা। আর সেই মানুষটার চ্যাপটা চেহারা।

চ্যাপটা চেহারা, মানে বেঁটে?

বেশি লম্বা না, মোটা, বুকে বন-মাইনসের মতন লোম। হাতে একটা শানকি।

শানকি কাকে বলে?

শানকি, শানকি।

ও, বুঝেছি। টিনের থালা। আজকাল সেরকম থালা পাওয়া যায়। সেই শানকিতে খাবার ছিল?

কয়েকখান রুটি আর গুড়। সেই শানকিটা রেখে সে চলে গেল। আবার খানিক বাদেই এসে সে দিয়ে গেল আমাদের শাড়ি আর বেলাউজ।

তোমরা চটি পরে যাওনি?

চটি ঘরেই এক কোণে ছিল, নেয় নাই।

আগে খেতে শুরু করলে, না আগে পোশাক পরে নিলে?

বলেন কি সাহেব! কোনও মেয়েমানুষ কি শাড়ি-টাড়ি না পরে খেতে পারে? মুখে খাবার ওঠে?

ধরো যদি তখনই শাড়ি-টাড়ি ফেরত না দিত? খিদেও তো খুব পেয়েছিল। তা হলে কী করতে? যাই হোক, এটা অবান্তর প্রশ্ন। আই অ্যাম সরি। গোলাপি তোমাকে প্রথম কথাটা কী বলল?

গোলাপি কইল, মরছি রে মরছি। আমরা ডাকাইতের হাতে পড়ছি।

ডাকাত? তোমাদের সেই সাফলদি না কী, সে কোথায় গেল?

তারে আর দেখি নাই। ওইখানে আর দেখি নাই।

ওই ঘরটাতে কতদিন রইলে?

সেই রাইত। পরের দিন। আবার একটা রাইত।

ওই চ্যাপটা লোকটা ছাড়া আর কেউ আসেনি ঘরে?

পরের রাইতে এসেছিল। সাঁ জওয়ান, কপালে ফেট্টি বান্ধা। সে-ই আসল ডাকাইত। ভাবলেও এখনও আমার, এই দ্যাখেন, এই দ্যাখেন সাহেব, আমার শরীলডা কঁপতেছে। আমি জীবনে কখনও পাপ করি নাই, কারুরে ঠকাই নাই, তবু আমার কেন এই শাস্তি, আমার ছেলে। আর মেয়ে কোথায় রইল, কতদিন দেখি না।

শোনো, তোমার নিশ্চয়ই এখন খিদে পেয়েছে। আমারও লাঞ্চ টাইম। তুমি খেয়ে-টেয়ে কিছুক্ষণ জিরিয়ে নাও। আবার কথা হবে। ভালো করে ভাবো, কিছু যেন বাদ না পড়ে। কিছু গোপন করবে না। ওই সাফলদির কথা বেশি করে জানতে হবে।

স্যার, আমার ছেলে আর মেয়ের সঙ্গে কি একবার দেখা হবে না?

তারা তো এখানে নেই। তবে একটা কিছু ব্যবস্থা হবে নিশ্চয়ই।

১. ২

একটা বড় টেবিলের একধারে চেয়ারে বসে আছে মহিলাটি।

বয়েস বছর পঁয়তিরিশ-ছত্রিশ হবে। খয়েরি রঙের ব্লাউজ ও কস্তা ডুরে শাড়ি পরা। কপালটা অনেকটা চওড়া, এই সব মেয়েদের বলা হয় উঁচু কপালি।

চেহারা কেমন? অভাব, দারিদ্র্য ও দুর্ভাগ্যে পোড়া মুখ সুন্দর কি অসুন্দর, তার বিচারই চলে না। চোখ, মুখ, নাক ঠিকঠাকই আছে, মুখে একটা সারল্যের ভাবও আছে। আর এত কাণ্ডের পরও তার স্বাস্থ্যটি খারাপ নয়। সেটাই তো তার বিপদের কারণ।

হাজার খানেক বছর আগে এক কবি লিখেছিলেন, আপনা মাসে হরিণা বৈরি। হরিণীদের মতন মনুষ্যসমাজের নারীদেরও আজও পর্যন্ত প্রধান শত্রু তাদের শরীরের মাংস। এ রমণীর শরীরের গড়নটিও ভালো, বেশি লম্বাও নয়, বেঁটেও নয়। হাসলে তার বয়েস আরও কম দেখায়।

টেবিলের এপাশে বলে আছেন এক দীর্ঘকায়, বলশালী সুপুরুষ। মাথায় অল্প টাক চোখে সোনালি ফ্রেমের চশমা, কোট-প্যান্ট পরা, কিন্তু গলায় টাই নেই। তাঁর সামনে একটা ফাইল ও হাতে পেন্সিল, মাঝে-মাঝে ফাইলের পাতা ওলটালেও তিনি কিছু লেখেন না, পেন্সিলটা টেবিলে ঠুকে টকটক শব্দ করেন।

তার ডান পাশে একটু দূরে আর একটা চেয়ারে বসে আছেন আর একজন মধ্যবয়স্ক ব্যক্তি। ইনি তেমন কিছু সুপুরুষ নন, মাঝারি ধরনের চেহারা, বরং একটু মোটার দিকে ধাত। কলার দেওয়া পাঞ্জাবি ও পাজামা পরা, মাথার চুল নুন-গোলমরিচ রঙের, তীক্ষ্ণ নাক, গায়ের রং কালো নয়, বেশি ফরসা নয়। ইনি প্রায় নিঃশব্দ, একটার পর একটা সিগারেট টেনে যাচ্ছেন।

উচ্চপদস্থ রাজপুরুষটি রমণীটিকে বললেন, শোনো, তুমি সরিফন না লক্ষ্মী, সে বিষয়ে আমি এখনও মনস্থির করতে পারিনি। ফাইলটাতে পরিষ্কার কিছু বোঝা যাচ্ছে না। সে যাই হোক, তোমার অভিজ্ঞতার কাহিনি খুব লম্বা করার দরকার নেই। আসল ঘটনাগুলো জানলেই হবে। আমি কতকগুলো প্রশ্ন করব, তার ঠিক-ঠিক উত্তর দেবে। প্রথম কথা, তুমি বলছ, তোমার দুটি ছেলেমেয়ে আছে। তারপর এর মধ্যে তুমি কি আবার প্রেগন্যান্ট হয়েছিলে? মানে, তোমার পেটে আবার সন্তান এসেছিল?

না, সাহেব।

ঠিক বলছ?

জি সাহেব। আমার মায়ের দিব্যি বলছি।

তোমার মা বেঁচে আছেন?

আজ্ঞে না। আমার এগারো বছর বয়সে মা....

যারা মারা গেছেন, তাদের নামে মিথ্যে দিব্যি কাটা সহজ। শোনো, তুমি বাড়িছাড়া হয়ে আছ প্রায় এক বছর। এর মধ্যে তোমার একবার অ্যাবর্শান হয়েছে, মেডিক্যাল রিপোর্টে তা আছে। তা হলে নিশ্চয়ই অন্য কারও সঙ্গে।

না, না, স্যার। এক বছর না, বড়জোর সাত-আট মাস হবে। পেটে যদি কিছু এসে থাকে, তবে তা আগেই, আমার সোয়ামির, আমি অন্য কোনও...

শোনো। তোমরা গ্রামের মেয়ে, তোমরা সরল ভাবে কিছু কিছু মিথ্যে কথা বলো আমি জানি। কোনও-কোনও ঘটনা মেনে নেওয়ার চেয়ে মৃত্যুও ভালো মনে করো, তাই না? কিন্তু তোমাকে বাঁচাবার জন্যই সব সত্যি কথা জানা আমাদের দরকার। তুমি যাই-ই বলো না কেন, ডাক্তারি পরীক্ষায় আসল সত্য ধরা পড়ে যায়। তোমার একবার গর্ভপাত হয়েছে তিন মাস আগে। তখন তোমার গর্ভের ফুলটির বয়েস ছিল সাড়ে তিন মাস। সুতরাং সেটি তোমার স্বামীর সন্তান হতেই পারে না।

রমণীটি মুখ নীচু করে রইল।

রাজপুরুষটি তার ডান দিকের বন্ধুটির দিকে এক পলক তাকিয়ে নিজেও একটি সিগারেট ধরালেন।

তারপর অত্যন্ত নরম গলায় বললেন, শোনো মেয়ে, তোমাকে কথার মারপ্যাঁচে বিপদে ফেলার কোনও উদ্দেশ্যই আমার নেই। এর মধ্যে যা-যা ঘটেছে, তার অনেক কিছুর জন্যেই তুমি দায়ী নও, আমি জানি। তোমাকে বাধ্য হয়ে মেনে নিতে হয়েছে। পুরুষরা মেয়েদের কত কিছু মেনে নিতে বাধ্য করে। আবার অনেক মেয়ে বোকার মতন ভুলও করে। লোভের বশে। ফঁদে পা দেয়। নিজের ভবিষ্যৎ নিজেই বোঝে না। এ দেশ থেকে অনেক মেয়েকে আড়কাঠিরা মিথ্যে কথায় ভুলিয়ে ভালিয়ে নিয়ে যায়, চুরি করে, জোর করেও পাচার করে দেয়। আবার কিছু কিছু মেয়ে স্বেচ্ছায় ঘর ছাড়ে। তারাই বেশি হতভাগ্য। যা আশা করে ঘর ছাড়ে, তা পায় না। তোমার বয়েসি কোনও মেয়ের স্বেচ্ছায় ঘর ছাড়া তেমন স্বাভাবিক নয়।

এবার তুমি বলো, তুমি ঘর ছেড়েছিলে কি মেলা দেখতে যাওয়ার লোভে? একজনকে বিশ্বাস করে? নাকি তুমি ঘর ছাড়তেই চেয়েছিলে? একেবারে সত্যি কারণটা আমাদের জানা দরকার। যা বলবে, আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বলবে। মুখ নীচু করে থাকবে না।

বাবু, তাইলে আপনি আগে একটি কথা বলেন তো? অনেক মেয়ের তো বিয়াই হয় না। গরিব ঘরের মেয়েদের বিয়ে হওয়াটাই তো ভাগ্যের কথা। আমার বিয়া হয়েছিল। স্বামী পেয়েছি। সন্তান পেয়েছি। তবু আমি নিজের ইচ্ছায় ঘর ছাড়ব কেন? নিশ্চিন্ত আশ্রয় ছেড়ে কোনও মেয়ে কি বাইরে পা বাড়ায়। পুরুষরা যেতে পারে। মেয়েরা কি যায়? সন্তানের টানই তো বড় টান। তাদের ছেড়ে কেউ যায়?

তোমার কথা পুরোটা ঠিক না হলেও অনেকটা ঠিক বলেছ। সাধারণত পুরুষরাই ঘর ভাঙে। বউকে ছেড়ে অন্য মেয়ের কাছে যায়। সন্তানের টানও পুরুষদের কম। তবু, এসব সত্ত্বেও কখনও কখনও মেয়েরা ঘর ছাড়ে, যদি অন্নে টান পড়ে। দু-বেলা যদি ভাত না জোটে, বাচ্চারাও খেতে না পায়। কিংবা স্বামী বা শাশুড়ি অত্যাচার করে মারে, তা বেশিদিন সহ্য করতে না পেরে...। তোমার শ্বশুরবাড়িতে তোমার ওপর কখনও অত্যাচার করা হত? মার খেয়েছ? তোমার স্বামী...

না, সাহেব, সোয়ামির হাতে আমি কখনও মাইর খাই নাই। আর অন্নে টান, তা ছিল, গ্রীষ্মকালের তিন মাস দুই বেলা ভাত জুটত না, শুধু আমানি খেয়ে থেকেছি। তবু অসহ্য হয় নাই। নিজেরা আধপেটা থেকেও ছেলেমেয়েদের খেতে দিয়েছি। তা হলে ঘর ছাড়ব কেন, বলেন?

তবে শুধু মেলা দেখার টানেই বেরিয়েছিলে?

ইচ্ছা হয়েছিল, নিজের গেরামের বাইরেও কত গেরাম আছে, কত মানুষ আছে, যাই, একটু দেখে আসি। সোয়ামি রাজি হয়ে গেল, এমনকী শেষ পর্যন্ত পাঁচটা টাকাও দিয়েছিল।

তোমার স্বামী আগে কখনও তোমাকে এরকম ভাবে অন্যদের সঙ্গে যেতে দিয়েছে?

না।

এবার যে এক কথায় রাজি হল, তাতে তুমি অবাক হওনি?

একটু হয়েছিলাম। কিন্তু তখন বেড়াবার নামে এমন নেচে উঠেছিলাম যে অন্য কথা ভাবি নাই।

তোমার স্বামী ঘরামির কাজ করে?

জি। টালির কাজ জানে। তয় এখন টালির কাজ কমে গেছে, টিনের চাল হয়, ছাদ ঢালাই হয়, সে-সব পারে না। একটা পা-ও কমজোরি।

ঠিক আছে, তোমার স্বামীর কথায় পরে আসছি। এখন বলো, আগে যে বলেছিলে ট্রেন থেকে নামিয়ে নেওয়ার পর ঘুমন্ত অবস্থায় যে ঘরটায় তোমাকে আর গোলাপিকে রেখেছিল, সেখানে তুমি মোটে দুরাত্তির ছিলে। তাই না?

হ, দুই রাত্তির।

ফাইলে রিপোর্টে লেখা আছে, সেখানে তুমি ছিলে মোট পাঁচদিন।

তা হতে পারে, হিসাব মনে নাই।

কোর্ট জানো তো? আদালত। সেখানে যখন তোলা হবে, তখন ঠিক-ঠিক উত্তর দিতে হবে। একবার দু-রাত্তির, একবার পাঁচদিন বললে চলবে না। অবশ্য, আমি জানি, মনে না থাকাও অস্বাভাবিক কিছু না। দ্বিতীয় রাত্তিরে যে লোকটি তোমার ওপর অত্যাচার করেছিল, সে কি তোমায় শেষ পর্যন্ত...

না, না, না, হুজুর। মা কালীর দিব্যি। আমারে পারে নাই। গোলাপিরে প্রথমে ধরে ছিল।

তোমাকে পারেনি সেই রাত্রে। তার পরেও আরও তিন রাত্রি। সে কি পরে পেরেছিল?

হা ভগবান, হা ভগবান, আমারে বিষ দিলা না কেন?

বুঝেছি। তোমার দোষ নেই। ভগবান এত ব্যস্ত থাকেন যে তোমার মতন মেয়েদের প্রার্থনা শোনার সময় পান না। তার বিষের স্টকও এখন কম। তোমাকে দোষ দিচ্ছি না, পুরুষদের গায়ে জোর বেশি, তারা অনেক কিছু করতে পারে। তোমাকে আমি এই কখানা ছবি দেখাচ্ছি। এর মধ্যে সেই রাতের গোরিলাটি আছে কি না দ্যাখো তো।

.....

কাঁদছ কেন? চোখের জল এখন খরচ কোরো না, পরে অন্য কোনও সময়ের জন্য তুলে রাখো। ছবিগুলো ভালো করে দ্যাখো। একজনকেও চিনতে পারছ?

না, সাহেব।

এরা সবাই একবার করে ধরা পড়েছে। তোমার কাছে যে এসেছিল, সে তা হলে আরও গভীর জলের মাছ। এদের মধ্যে প্রথা আছে, যেসব মেয়েদের এরা ভুলিয়ে ভালিয়ে কিংবা জোর করে নিয়ে আসে, দূরে কোথাও বিক্রি করে দেয়, তারা আগে, তারা মানে যে এদের পাণ্ডা, সে প্রত্যেকটি মেয়েকে একবার গুরুপ্রসাদী করে দেয়। তার প্রধান উদ্দেশ্য দুটি। এক তো, নিজেদের যৌন লোভ মেটানো, আর দ্বিতীয় হল, এই সব মেয়েদের মধ্যে একটা অপরাধ বা পাপবোধ ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। অর্থাৎ সতীত্ব তো নষ্ট হয়ে গেলই, এখন আর বেশি তেড়িবেড়ি করে কী হবে। ফিরে যাওয়ার পথ যে বন্ধ, তা যে-কোনও গ্রামের মেয়েও জানে। ধরব, ওই পালের গোদাটাকেও ধরব। শোনো, ট্রেন থেকে নামিয়ে তোমাদের যেখানে রাখা হয়েছিল, সে জায়গাটার নাম সালার। মুর্শিদাবাদ জেলার সালার। ওখানে কিছুদিন পাচারকারীদের ঘাঁটি ছিল। কিছুদিন অন্তর-অন্তর এরা ঘাঁটি পালটায়। সালার থেকে বিহারে পাচার করা সহজ।

হাঁ সাহেব, আমি সালার নামটা কয়েকবার শুনেছি।

তোমাদের দলে ছিল এগারোটা মেয়ে। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা থেকে সংগ্রহ করা। এদের মধ্যে কয়েকজনকে আগেই জড়ো করা হয়েছিল বাংলাদেশ থেকে। দুজন নেপালি। হিন্দু

মুসলমানের কোনও ভেদ নেই, মেয়ে-বিক্রির বাজারে সবাই মেয়ে। তোমাদের এই দলটাকে সালার থেকে নিয়ে যাওয়া হয় কঁসি। পুলিশ সবই খবর জোগাড় করেছে, কিন্তু অনেক পরে। এখন ফাইল রেডি, অথচ পাখি হাওয়া। এই লক্ষ্মী ওরফে সরিফন ছাড়া আর একটি মেয়ের সন্ধান আমরা পেয়েছি, সে মেয়েটির কথা পরে হবে।

সাহেব, গোলাপির কী হল? সে কোথায় গেল?

ফাইলে তার কথা আর বিশেষ কিছু নেই। যতদূর মনে হয় তাকে পাচার করা হয়েছে সৌদি আরবে। তোমাকেও সেখানেই পাঠাবার সব ব্যবস্থা ঠিকঠাক হয়ে গিয়েছিল, একেবারে শেষ মুহূর্তে বোধহয় আটকে যায়। পুলিশের তাড়া খেয়ে পালায়। নইলে এতক্ষণে তুমি পা পর্যন্ত ঢাকা বোরখা পরে থাকতে আর আরব শেখদের পদসেবা করতে!

সৌদি আরব কোথায়?

তোমাদের গ্রাম থেকে কিছুটা দূরে। ডায়মন্ড হারবার থেকেও দূরে। কলকাতা থেকেও...সে যাই হোক, আসল কথা হল, তুমি কতদূর গিয়েছিলে, আর কোথা থেকে ফিরলে।

আমি এখন কোথায়?

খুব ভয়ের জায়গায়। তোমাদের গ্রামে সবাই কলকাতার নাম শুনলেই ভয় পায় না?

না, সাহেব। কত লোক কলকাতায় কাজ করতে আসে। আমি তো মুখ-সুখ মানুষ। কী করে এখানে এসেছি, তাও জানি না।

তুমি জানো না। অথচ তুমি সারা দেশ ঘুরে এসেছ। এরকমই তো হয়। ঝাঁসির নাম শুনেছ তুমি? খুব সম্ভবত শোনোনি।

আজ্ঞে না।

একজন নারী, দারুণ তেজস্বী ছিলেন, ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন। নিজে ঘোড়ায় চড়ে লড়াই করতেন। লোকে বলে, সাহেবদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে করতে যখন দেখলেন ধরা পড়া ছাড়া আর উপায় নেই, তখন একটা দুর্গ থেকে ঘোড়া শুদ্ধ ঝাঁপ দিলেন, তবু ধরা দিলেন না। এরকম স্মৃতি বিজড়িত এক অসাধারণ নারীর সেই জায়গা, যে আঁসির রানি লক্ষ্মীবাই দারুণ গর্বের সঙ্গে বলেছিলেন, মেরি আঁসি নেহি দেউঙ্গি, আজ সেখানেই নারী। পাচারের একটি কেন্দ্র! হয়তো এসব কিছুই তুমি বুঝবে না। তোমাকে বারবার ঘুমের ওষুধ খাইয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায়। ওই কঁসিতে তুমি ছিলে পাঁচ সপ্তাহ। সেখানকার কথা কিছু মনে আছে?

সেখানে কি পাহাড় ছিল?

ঝাঁসিতে ছোট-ছোট টিলা আছে। পাহাড় ঠিক বলা যায় না। ঝাঁসিতে আমি গেছি অনেক দিন আগে, দুর্গটাও একটা টিলার ওপরে। তবে তোমাদের কাছে টিলাও তো পাহাড়।

আমি ভাবতাম ম্যাঘ। আকাশের গায়ে ম্যাঘ। কয়দিন পর ভাবলাম, ম্যাঘ কি রোজ রোজ একইরকম থাকে? ম্যাঘ তো উইড়া যায়। তখন একজন কইল, ম্যাঘ না, ওইরে কয় পাহাড়।

একজন বলল, সেই একজনটা কে? সে কি বাংলায় কথা বলেছিল?

না, হিন্দিতে।

তুমি হিন্দি বোঝ?

একটু-একটু বুঝি। সে-ও একজন মেয়েলোক, দুই হাত ভরতি কাচের চুড়ি। একদিন। দেখি সব চুড়ির রং লাল, আর একদিন দেখি সব সবুজ। সে আমাদের খাবার দিত।

আমাদের মানে? তোমরা কজন ছিলে সেখানে?

পাঁচজন। তার মধ্যে দুইজন নেপালি। বাংলা বোঝে না। একজন বেশ ছোট, ষোলো সতেরো বছর বয়েস। সে খালি কান্দে। সব সময় কান্দে। তার কান্না শুনলে আমারও কষ্ট হয়। কান্না আসে। কিন্তু জোরে কান্দলেই একজন এসে মারে। চুলের মুঠি ধরে লাইথথ্যায়। তাই আমি পলাইলাম একদিন।

এই সময় একজন আর্দালি এসে প্রশ্নকারী পুলিশ অফিসারটির হাতে একটা চিরকুট দিল।

সেটা পড়ে নিয়ে অফিসারটি বললেন, নাঃ, আজ আর বসা যাবে না। আমাকে এক্ষুনি একবার রাইটার্স বিল্ডিংস যেতে হবে। কাল আবার সকাল সাড়ে দশটায়।

আর্দালিকে নির্দেশ দিলেন লক্ষ্মী নামের স্ত্রীলোকটিকে কাস্টোডিতে রেখে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে। তারপর তার পাশে বসা ব্যক্তিটিকে বললেন, চলো, আমরা বেরোই, তুমি যদি চাও, তোমাকে পথে কোথাও নামিয়ে দিতে পারি।

আলিপুরের ভবানীভবন থেকে বেরিয়ে গাড়িতে উঠতে-উঠতে পুলিশ অফিসার হুমায়ুন কবির তার বন্ধু বিনায়ক ঘোষালকে বললেন, শুনছো তো সব, মেয়েটির কথা? গল্প নয়, একেবারে কঠিন বাস্তব।

বিনায়ক বললেন, বাস্তব তো বটেই, ট্র্যাজিকও বটে। কিন্তু নতুনত্ব কী আছে? বহু মেয়ের জীবনেই তো এরকম ঘটছে?

হুমায়ুন বললেন, নতুনত্ব না থাকতে পারে, তবু প্রতিটি মেয়েরই জীবনটা তো আলাদা।

বিনায়ক গাড়িতে বসে বললেন, মাঝে-মাঝে আমার নিজেরই ইচ্ছে করছে দু-একটা প্রশ্ন জিগ্যেস করতে। কিন্তু তা বোধহয় উচিত হবে না।

একদম উচিত নয়। তুমি বাইরের লোক, তোমাকে আমি বন্ধু হিসেবে এনেছি। যদি তোমার বিশেষ কিছু জানতে ইচ্ছে হয়, তুমি আমাকে ইংরিজিতে সেটা বলতে পারো। তারপর আমি ওকে জিগ্যেস করব, সেটা অফিশিয়াল হয়ে যাবে।

–আমি একটা ব্যাপার বুঝতে পারছি না হুমায়ুন, তুমি এই লক্ষ্মীমণি আর সরিফন বিবির ব্যাপারটা পরিষ্কার করছ না কেন? এ মেয়েটিকে তো লক্ষ্মীমণি বলেই মনে হচ্ছে।

–মুশকিল হচ্ছে কী জানো, লক্ষ্মীমণি নামে কারুর মিসিং ডায়েরিতে নাম নেই, কেউ তার নামে থানায় কিছু জানায়নি। অথচ সরিফন বিবির নামে ডায়েরি আছে, ওই একই জায়গা থেকে যে নিরুদ্দেশ হয়েছে। অথচ ঘটনা যা ঘটছে, মানে মেয়েটি যা বলছে, তাও ফাইলের রিপোর্টের সঙ্গে অনেকটা মিলে যাচ্ছে। এ মেয়েটি যদি সরিফন না হয়, তাহলে তার জীবনের সব ঘটনা এ জানবে কী করে?

–তোমাদের রিপোর্টে নিশ্চয়ই নামের গন্ডগোল হয়েছে।

–তা তো হতেই পারে। কিন্তু একটা ব্যাপার বোঝা যাচ্ছে, সরিফন বিবি মিশিং এটা যেমন ঠিক, আর এই লক্ষ্মীমণিও চালান হয়েছিল। দুজনের কাহিনি মিশে গেছে। সেইজন্যই আমি এর কাছ থেকে ডিটেইল্স জানতে চাইছি।

–আচ্ছা, হুমায়ুন, আমাদের এই পশ্চিম বাংলা থেকে এত মেয়ে বাইরে চালান যায়, তোমরা পুলিশরা কিছু করতে পারো না? এটা তো তোমাদের পক্ষে একটা ডিসগ্রেস।

শুধু পুলিশের দোষ দিচ্ছ, দোষ তো গোটা সমাজের। যে সমাজে মেয়েদের কোনও মর্যাদা নেই, শিক্ষা কিংবা জীবিকার সুযোগ এত কম, সেই সব সমাজে মেয়েদের নিয়ে ছিনিমিনি খেলা তো চলবেই। বহুকাল ধরে চলে আসছে। বাংলাদেশ থেকে, নেপাল থেকেও প্রচুর মেয়ে চালান হয়।

–খবরের কাগজগুলোও এ ব্যাপারে বেশি উচ্চবাচ্য করে না। এইসব খবর চাপা দেওয়ার একটা চেষ্টা চলে মনে হয়।

–আর তোমরা লেখকরাই বা কী করছ, বিনায়ক? তোমাদের কিছু দায়িত্ব নেই? এক সময় লন্ডন শহরে বেশ্যাবৃত্তির খুব রমরমা ছিল। সেই সময় জর্জ বার্নার্ড শ একটা নাটক

লিখেছিলেন, মিসেস ওয়ারেন্স প্রফেশনস, তাতে উচ্চবিত্ত বিলিতি সমাজের মুখোশ খুলে দিয়েছিলেন। তোমরা বাঙালি লেখকরা সেরকম কিছু লিখতে পারো না? এই যে কলকাতা শহরে সোনাগাছি বলে বিরাট একটা পতিতাপল্লি আছে, তোমাদের কোনও লেখায় তার উল্লেখ থাকে? শরৎচন্দ্র তবু লিখেছিলেন একটুআধটু, তাও এমন একটা রোমান্টিক ভাব দিয়েছিলেন যে আসল ব্যাপারটা কিছুই ফুটে ওঠেনি।

বিনায়ক বললেন, ব্যাপারটা অত সহজ নয়। পরে আলোচনা করব। তুমি আপাতত আমাকে রবীন্দ্রসদনের কাছে নামিয়ে দাও।

হুমায়ুন বললেন, ঠিক আছে। তুমি কাল আসছ? আমি বরং অফিসে আসার সময় তোমার বাড়ি থেকে তুলে আনব। অ্যারাউন্ড টেন। আমি চাই তুমি এই মেয়েটির ঘটনা সবটা শুনে দেখো। তুমি এর থেকে তোমার লেখার মাল-মসলা পেয়ে যেতে পারো।

বিনায়ক বললেন, ঠিক আছে, আমি দশটার সময় তৈরি থাকব।

গাড়ি থেকে তিনি নেমে গেলেন।

রবীন্দ্রভবনে এখন একটা নাট্য-উৎসব চলছে। ভারতের বিভিন্ন রাজ্য থেকে এসেছে নাটকের দল। বড়-বড় সব ছবিওয়ালা হোর্ডিং চতুর্দিকে। লোকজন আসছে প্রচুর।

বিনায়ক গেট দিয়ে ঢুকে একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন।

এইসব নাটকে কত উচ্চাঙ্গের শিল্পের ব্যাপার থাকে। নারী স্বাধীনতা বিষয়ে বাণী দেওয়া হয়। দর্শকরা উপভোগ করে। আর এখান থেকে তিরিশ-চল্লিশ মাইল দূরে যে-সব গ্রাম সেখান থেকে গরিব ঘরের মেয়েরা আজও পাচার হচ্ছে, বিক্রি হচ্ছে মাংসের বাজারে। চালান যাচ্ছে আরব দেশে।

এটাই বাস্তবতা। সেই সব মেয়েরা সারা জীবনে জানতেই পারে না, স্বাধীনতা কাকে বলে।

বিনায়ক একটা ছোট্ট দীর্ঘশ্বাস ফেলে নাটক দেখার জন্য হলের মধ্যে ঢুকে গেলেন। তিনি এখানকার একজন কমিটি মেম্বার, তার টিকিট লাগে না।

পরদিন ঠিক দশটা বেজে পাঁচ মিনিটে হুমায়ুন কবিরের গাড়ি এসে হাজির। প্রত্যেকদিন বাড়ি থেকে বেরুবার সময় হুমায়ুন স্নানটান করে ফিটফাট হয়ে বেরোন। বিনায়ক রোজ দাড়ি কামান না, কখনও তিন-চারদিনও বাদ পড়ে যায়। এক-একদিন স্নান করতেও ভুলে যান।

বিনায়কের স্ত্রী একটি স্কুলে পড়ান, তিনি বেরিয়ে যান একটু আগেই। ওদের একটিমাত্র ছেলে কলেজে পড়ে। সে বলল, বাবা, তুমি বেরুচ্ছ। আমার আজ একশোটা টাকা লাগবে।

বিনায়ক মানিব্যাগ রাখেন না, শার্টের বুক পকেট থেকে একশো টাকার একটা নোট বার করে দিয়ে হেসে বললেন, আমি যখন কলেজে পড়তাম, তখন আমার বাবা আমাকে সারা মাসের জন্য মোটে তিরিশ টাকা হাত খরচ দিতেন। আর তুই যখনতখন একশো টাকা চাস!

বিনায়কের ছেলে সুপ্রতিম বলল, তোমাদের সে আমলে টাকার দাম কত বেশি ছিল। তুমিই তো বলেছিলে, সে সময় পাঁচ টাকায় একটা চিংড়ির কাটলেট পাওয়া যেত। এখন পঞ্চাশ টাকা।

বিনায়কের মনে পড়ল, ছাত্র বয়েসে তিনি বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে একবার সোনাগাছি বেশ্যাপল্লিতে গিয়েছিলেন। ওই নিষিদ্ধ এলাকাটা সম্পর্কে কৌতূহল ছিল কৈশোর বয়েস থেকেই। বাসে করে ওই এলাকার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় আড়চোখে তাকাতেন। কলেজে এসে অনেক সংস্কারই ভাঙতে ইচ্ছে করে।

বেশ্যাপল্লিতে গিয়ে ঠিক অপরাধবোধ হয়নি, তবে কেন যেন একটু-একটু ভয় করছিল। গল্প-উপন্যাসে ওইসব জায়গার সঙ্গে গুন্ডা-বদমাশদের যোগাযোগের কথাও থাকে।

সেদিন তিন বন্ধুতে মিলে একটি মেয়ের ঘরে গিয়ে কিছুক্ষণ গল্প-টল্প করেই চলে এসেছিলেন। একজন বন্ধু শুধু চলে আসার আগে হঠাৎ মেয়েটিকে জড়িয়ে ধরে একটা চুমু খেয়েছিল। বিনায়ক মেয়েটিকে একবারও স্পর্শ করেননি।

এক ঘণ্টা সেই মেয়েটির ঘরে সময় কাটাবার জন্য দিতে হয়েছিল পনেরো টাকা। সেটাই তার রেট। তিন বন্ধু ভাগাভাগি করে দিয়েছিল টাকাটা।

তাঁর ছেলে কাটলেটের দাম বলা মাত্র বিনায়কের হঠাৎ যেন এক বেশ্যার এক ঘণ্টা রেটের কথা মনে পড়ল? স্মৃতির এই লেখা বোঝা খুব শক্ত। এখন ওদের রেট কত? বিনায়ক আর কখনও যাননি।

একথাও তার অবধারিতভাবে মনে হচ্ছে, তার ছেলেও কি বন্ধুদের সঙ্গে বেশ্যাপল্লিতে গেছে কখনও? সরাসরি জিগ্যেস করা তো যায় না। তবে সম্ভাবনা কম। এখন ছেলে আর মেয়েদের মেলামেশা কত সহজ হয়ে গেছে। বিনায়কের যৌবনকালে মেয়েদের সঙ্গে গোপন সম্পর্ক স্থাপন করতে হত অনেক সাবধানে, বন্ধু-বান্ধবদেরও না জানিয়ে। এখন কলেজের ছেলে আর মেয়েরা কলকাতার বাইরে একসঙ্গে বেড়াতে যায় দু-তিনদিনের জন্য। সুপ্রতিমই তো গত মাসে বাইরে ঘাটশিলা থেকে ঘুরে এল, তিনটি ছেলে আর দুটি মেয়ে, একটা বাংলোতে ওরা রাত কাটিয়েছে। আজকাল সব মেয়েদেরই বোধহয় বিয়ের আগে শারীরিক সম্পর্কের অভিজ্ঞতা হয়ে যায়।

বিনায়কের দেরির সময়টায় হুমায়ুন খবরের কাগজ পড়ছিলেন, বিনায়ক গাড়িতে ওঠার পর তিনি বললেন, আজ ইন্টারোগেশানটা শেষ করে ফেলব ভাবছি। সারাদিন লেগে যেতে পারে। দুপুরে কি তোমায় বাড়িতে ফিরতে হবে?

বিনায়ক বললেন, না ফিরলে বাড়িতে ফোনে বলে দেব।

হুমায়ুন বললেন, কাল সরিফনবিবির পুরো রিপোর্ট পেয়েছি। মুন্সিগঞ্জ আর নবীপুর এই দুটো পাশাপাশি গ্রাম। এই নবীপুরের কালু মির্জার তিন মেয়ের এক মেয়ে সরিফন। এক

শনিবারের হাট থেকে সে আর বাড়ি ফেরেনি। আড়কাঠির দল তাকে জোর করে ধরে নিয়ে গিয়েছিল বলেই মনে হয়। তারপর তাকে বঁসিতে একবার ট্রেস করা গেছে। এই লক্ষ্মিমণিও ঝাঁসির কথা বলল।

বিনায়ক বললেন, ওই সরিফনকে যে ঝাঁসিতে ট্রেস করা গেছে, তা তোমরা কী করে জানলে?

সারা দেশেই তো এই সব চোরাচালানিদের ঘাঁটি আছে। পুলিশ যে একেবারে কিছু করে না, তাও তো নয়। হয়তো দেরিতে খবর পায়। তখন পুলিশের রেইড হয় ওইসব ঘাঁটিতে। পুলিশ কয়েকজনকে রাউন্ড আপ করে। কখনও আবার পুলিশ পৌঁছোবার আগেই পাখি উড়ে যায়। আগেই রেইড-এর খবর পেয়ে সেই দলবল পালিয়ে যায়।

–আগেই খবর পায় কী করে? নিশ্চয়ই পুলিশেরই কোনও লোক তাদের খবর দিয়ে দেয়?

–সেটাও মিথ্যে নয়। বাংলায় কথা আছে না, সর্ষের মধ্যেই ভূত। পুলিশের মধ্যেই এরকম অনেক ভূত আছে। আসলে তো প্রচুর টাকার খেলা। এইসব বদমাশরা এত বেশি ঘুষ অফার করে যে অনেকেই লোভ সামলাতে পারে না।

–এখন আর বেশি কমের ব্যাপার নেই। তোমাদের পুলিশ ডিপার্টমেন্টে নীচের তলায় লোকেরা তো দশ-কুড়ি টাকা ঘুষ নিতেও ছাড়ে না।

–আপাতত ওই বিষয়টা থাক। আসল কথাটা বলি?

–ঠিক আছে, বলো।

–বিভিন্ন রাজ্যের পুলিশ এইসব মেয়ে পাচারকারীদের ধরে যে-সব রিপোর্ট বানায়, সেগুলো আবার সব রাজ্যেই এক্সচেঞ্জ হয়। সবগুলো মিলিয়ে আমরা আবার একটা রিপোর্ট তৈরি করি। সেই অনুযায়ী, ঝাঁসিতে এক সরিফনের উল্লেখ আছে, যদিও সেখানে

তাকে উদ্ধার করা যায়নি। লক্ষ্মীমণির কোনও কিছু উল্লেখ আমরা এ পর্যন্ত পাইনি। অথচ এর কাহিনিটাও মিথ্যে হতে পারে না।

বোঝাই যাচ্ছে, তোমাদের রিপোর্টে ভুল আছে। আচ্ছা, তুমি কী করে লক্ষ্মীমণিকে বললে যে সে কঁসিতে পাঁচ সপ্তাহ ছিল?

–পুলিশ যখন কোনও একটা পাচারকারীদের আখড়ায় গিয়ে রেইড করে, তখন যদি দেরি হয়ে যায়, যদি মেয়েদের নিয়ে দালালরা আগেই পালিয়ে যায়, সেখানেও কাছাকাছি কিছু লোককে পুলিশ জেরা করে। এমন কয়েকজনকে পাওয়া যায়, যারা ওইসব পাচারকারীদের সাহায্য করে, তাদের অ্যারেস্ট করতে হয়।

তারা তো সব চুনোপুঁটি!

হ্যাঁ, চুনোপুঁটি হলেও তাদের পেট থেকে অনেক খবর বার করা যায়। তাদের কাছ থেকেই কিছু কিছু মেয়ের নামও জোগাড় হয়। এইসব মিলিয়ে একটা কেস হিস্ট্রি তৈরি হয়। আরও দু-জায়গায় সরিফনের উল্লেখ আছে, একবার সে প্রেগন্যান্ট হয়েও পড়েছিল। শেষবার তার উল্লেখ আছে দিল্লির এক রিপোর্টে। তার থেকেই বোঝা যাচ্ছে, সে আরব দেশে চালান। হয়নি। প্রেগন্যান্ট হয়ে গেলে তার বাজারদর অনেক কমে যায়।

–এমনও হতে পারে, ঝাঁসিতে দু-ব্যাচ মেয়ের মধ্যে সরিফন আর লক্ষ্মীমণি, দুজনেই ছিল?

তবু কেউ কারুকে চিনবে না?

–সেটাও অসম্ভব কিছু নয়।

–দেখা যাক, জেরায় শেষ পর্যন্ত লক্ষ্মীমণি আর সরিফনের কাহিনির আলাদা কিছু বেরিয়ে আসে কি না। দিল্লিতে রেড করে অনেক মেয়েকে উদ্ধার করা হয়েছে। কিন্তু সেখানেও সরিফনকে পাওয়া যায়নি। একটা পিকিউলিয়ার ব্যাপার কি জানো, দিল্লিতে একজন

লক্ষ্মীমণির উল্লেখ আছে। সে আর এই মেয়েটি একই কিনা তা এখনও বলা যাচ্ছে না। দেখা যাক, এর গল্প কোথায় গিয়ে পৌঁছোয়। দিল্লির লক্ষ্মীমণিকে কিন্তু রিপোর্টে মৃত বলা হয়েছে। সে খুন হয়।

কাহিনির শেষটা আগে বলে দিও না। মনে তো হচ্ছে, দুটো লক্ষ্মীমণি আলাদা হওয়াই সম্ভব।

দুই বন্ধু দুটি সিগারেট ধরালেন।

একটুপরে বিনায়ক বললেন, কাল তো তুমি আমাকে রবীন্দ্রসদনে নামিয়ে দিয়ে গেলে। তারপর আমি একটা নাটক দেখলাম। নাট্য উৎসব চলছে তো। আমার গোড়ার দিকে মিনিটসাতেক বাদ গেছে। সেই নাটকটার কথা তুমি একটু শুনবে?

হুমায়ুন বললেন, ইয়েস, অফকোর্স শুনব। কার নাটক?

–বিজয় তেন্ডুলকরের। তুমি না শুনেছ?

–বাঃ, শুনব না কেন? ওঁর ঘাসিরাম কোতোয়াল নামে একটা নাটক তো খুব নাম করেছিল, তাই না? উনি তো মারাঠি ভাষায় লেখেন।

–আমি তো ভেবেছিলাম, পুলিশের লোকেরা নাটক-ফাটকের কোনও খবরই রাখে না। হা, নাটকটা মারাঠি ভাষায়, কিন্তু বুঝতে আমার কোনও অসুবিধে হয়নি। নাটকটার নাম কমলা। এক-একদিন বেশ মজার ব্যাপার হয়। কাল তোমার অফিসে বসে মেয়ে পাচারের কাহিনি শুনছিলাম, তারপর এসে একটা নাটক দেখলাম, সেটাও ওই একই বিষয়ে। তোমার তো মনে আছে, একবার রাজস্থানের একটা মেলা সম্পর্কে রিপোর্ট বেরিয়েছিল দিল্লির কাগজে, তাতে খুব হইচই পড়ে গিলেছিল?

–হ্যাঁ, মনে আছে। এই তো বছর দু-এক আগের কথা। সরকার থেকে বলা হয়েছিল যে ওই রিপোর্টের সব কথাই মিথ্যে। মেয়ে বিক্রির ব্যাপার তো?

রাজস্থানের সেই মেলায় গরু-ছাগল-উট যেমন বিক্রি হয়, তেমনি মেয়েও বিক্রি হয়, রিপোর্টে এই কথাই ছিল। প্রকাশ্যে, মেয়েরা সার বেঁধে বসে আছে, লোকেরা বেছে-বেছে দর দাম করে কেনে। একটা গরুর চেয়ে একটা মেয়ের দাম শস্তা পড়ে বোধহয়।

এটা বেশি বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে। সাংবাদিকের গিমিক। এখনকার দিনে এটা হতে পারে না। গোপনে মেয়ে পাচার হয় ঠিকই। কিন্তু প্রকাশ্যে মেয়ে বিক্রি? অ্যাবসার্ড!

-এইরকমই তো অভিযোগ করা হয়েছিল সাংবাদিকটি সম্পর্কে? তাই নিয়েই নাটক। সাংবাদিকটিকে যখন দিল্লির অনেকে মিলে খুব অপমান করে, তখন সে সত্যি-সত্যি ওই মেলায় চলে গিয়ে সাতহাজার না কত হাজার টাকা দিয়ে সত্যি-সত্যি একটা মেয়েকে কিনে নিয়ে আসে। ওই মেয়েটিরই নাম কমলা। সে বিবাহিত, স্ত্রী আছে। স্ত্রীকে বুঝিয়ে মেয়েটিকে সে নিজের বাড়িতে এনে রেখেছিল। সে ঠিক করেছিল, পার্লামেন্ট খুললে সে মেয়েটিকে একেবারে পার্লামেন্টের সামনে হাজির করে দেখাবে যে দেশে মেয়েদের নিয়ে কত নৃশংস, অমানবিক কাণ্ড চলছে।

তারপর সেই সাংবাদিককেই পুলিশ গ্রেফতার করে, তাই না? কারণ, মানুষ বিক্রি করা যেমন বে-আইনি, তেমনি মানুষ কেনাও তো সমাজে বে-আইনি!

-হ্যাঁ, নাটকে অবশ্য একটু অন্যরকম ভাবে দেখানো হয়েছে। মোটকথা, তুমি কাল বলছিলে, এই সমস্যা নিয়ে সাহিত্যিকরা মাথা ঘামায় না কেন? এই তো একজন নাম করা নাট্যকার লিখেছেন, তা নিয়ে এক সময় কিছুটা হই-চইও হয়েছিল। তাতে কি সমস্যাটা একটুও কমল? সাহিত্য দিয়ে সমস্যার সমাধান করা যায় না। কাল যারা নাটকটা দেখলেন, তারাও একটা ভালো নাটক, ভালো অভিনয় এইসব নিয়ে মুগ্ধ হচ্ছেন, সমস্যাটা নিয়ে মাথা ঘামাবেন না। বার্নার্ড শ- এর যে-নাটকটার কথা বলছিলে, সেটাও ইংল্যান্ডের মেয়েদের অবস্থা নিশ্চয়ই কিছু বদলাতে পারেনি। লন্ডনে এখনও প্রচুর বেশ্যাবৃত্তি চলে।

–তা বলে তোমরা দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে পারো না। বারবার লিখে মানুষকে সচেতন। করতে হয়।

গাড়ি পৌঁছে গেছে ভবানীভবনে।

নেমে দাঁড়াবার পর বিনায়ক বলল, আর একটা কথা শোনেনা। ওই নাটকে একটা দৃশ্য আমার বিশেষ ভালো লেগেছে। একটু দাঁড়াও।

হুমায়ুন গেটের পাশটায় সরে এলেন। বিনায়ক বললেন, সাংবাদিক তো কমলা নামের মেয়েটিকে বাড়িতে এনে রেখেছেন। তার স্ত্রী বিদূষী, সুন্দরী, কোনও একটা কলেজে পড়ান। সমাজের আলোকপ্রাপ্তা মহিলা যাকে বলে। তিনিও এই মেয়ে বিক্রির ব্যাপারটাতে খুব উত্তেজিত। তিনি কমলার প্রতি সহানুভূতিশীল। ভালো শাড়ি দিয়েছেন, ভালো খেতে দিয়েছেন। তারপর খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে জিগ্যেস করতে লাগলেন, কমলার বাড়ির কথা, সংসারের কতটা অভাব, কেন তাকে বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে, এইসব। কমলাকে যে কিনে আনা হয়েছে, সে নিজে কিন্তু তা একটুও অস্বাভাবিক মনে করে না। একসময় সে খুব সরলভাবে প্রশ্ন করল, মাইজি, আপনার সাহেব আপনাকে কত দিয়ে কিনেছিলেন? সে মহিলা তো আঁতকে উঠে বললেন না, না, আমাদের এখানে...। ভদ্রমহিলা যাই-ই বলুন, প্রশ্নটা তো মিথ্যে নয়। তোমাদের মুসলমানদের মধ্যে কী সিস্টেম, ঠিক জানি না, হিন্দুদের মধ্যে, যতই বে-আইনি বলা হোক, তবু তো নানানভাবে পণপ্রথা চলছে! বাঙালি মেয়ের বাপ ছেলের বাপকে টাকা দেয়। উত্তরভারতে পাত্রপক্ষ টাকা দেয়। কেনাই তো হল।

১. ৩

লক্ষ্মীমণিকে আগেই সেই বড় ঘরটায় এনে বসিয়ে রাখা হয়েছে। সে বসে আছে দেয়াল ঘেঁষে, মেঝেতে। গতকালও প্রথমে সে চেয়ারে বসতে চায়নি। বারবার বলছিল চেয়ারে তো বাবু-বিবিরা বসে। গরিব মানুষদের জন্য নয়।

হুমায়ুন ঘরে ঢুকেই বললেন, লক্ষ্মীমণি, ওঠো। আমাদের সামনের এই চেয়ারটায় বসো।

আজও সে আপত্তি করতে যাচ্ছিল, হুমায়ুন আবার হুকুমের সুরে বললেন, ওঠো, ওঠো

লক্ষ্মীমণি শরীর মুচড়ে, খুবই আড়ষ্টভাবে বসল সেই চেয়ারে।

এবারে হুমায়ুন নরম ভাবে বললেন, এটা সরকারি অফিস। সরকারের চোখে সবাই সমান। তুমি গরিব কি বড়লোক, তাতে কিছু আসে যায় না। সেইজন্য আমাদের মতন তোমারও চেয়ারে বসার অধিকার আছে।

বিনায়ক আপন মনে হাসলেন। সে হাসিতে বিদ্রুপের সামান্য চিহ্ন আছে।

হুমায়ুন জিগ্যেস করলেন, কাল তোমাকে যেখানে রাখা হয়েছিল, সেখানে তোমার কোনও অসুবিধে হয়নি তো?

লক্ষ্মীমণি বলল, অসুবিধা? ছি ছি ছি। কিসের অসুবিধা। একখান বিছানা ছিল। মাঝ রাইতে কেউ ঘরে আসে নাই।

-ঠিক মতন খাবারটাবার দিয়েছিল? কী খেয়েছ?

-রুটি দিছিল, পাঁচখান। আর মাংস, চাইর টুকরা, বেশ বড়-বড় টুকরা। কাঁচা পেঁয়াজ চাইছিলাম, তা দেয় নাই। রুটির সঙ্গে পেঁয়াজ পাইলে বেশি ভালো লাগে। প্যাট ভইরা খাইছি।

মাংস দিয়েছিল? তবে তো ভালো কথা।

বিনায়কের দিকে তাকিয়ে হুমায়ুন বললেন, কাস্টোডিতে রাখার সময় পুলিশ মাংসও দেয়!

লক্ষ্মীমণির দিকে ফিরে জিগ্যেস করলেন, এই যতদিন তুমি বাড়ির বাইরে ছিলে, সেই সময়ে কখনও মাংস খেয়েছ?

লক্ষ্মীমণি বললেন, খাইছি। স্যাসের দিকে। প্রায় হার রোজ।

–আচ্ছা, থাক, শেষের দিকের কথা এখন বলতে হবে না। তুমি কঁসি থেকে পালাবার কথা বলছিলে। আগে বলো তো আঁসিতে ঠিক কোথায় ছিলে?

জায়গা তো আমি চিনি না। নামও জানি না।

নাম বলতে হবে না। থাকার জায়গাটা কেমন ছিল? বড় ঘর, এক ঘরে কজন মেয়ে?

–একখান খুব ভাংগা বাড়ি। মস্তবড় ঘর, কিন্তু একদিকে দেয়াল নাই। চ্যাটাই পেইত্যে শোয়া। সারাদিন দরজা বন্ধ থাকত, সন্ধ্যার পর খুইলা দিত একবার। তখনি একসঙ্গে সকলের পায়খানায় যাওয়া।

–এই যে বললে একদিকে দেয়াল নাই। তবে আবার দরজা বন্ধ থাকে কী করে?

–দেয়াল নাই, মানে, উচা দেয়াল, ওর উপরের দিকটায় অনেকখানি ভাংগা, পুরটা ভাংগা না।

–সেই ঘরে মোট পাঁচজন ছিলে?

–জি।

–খুব ভালো করে মনে করে দ্যাখো তো, তাদের মধ্যে সরিফন নামে কেউ ছিল?

সরিফন? না তো? নাম কইতেছি, বোলবুল, পুন্নিমা, সালেহা, আমি আর পদ্মা, এই পদ্মাই নেপালি আর অল্প বয়েস। খুব ফরসা!

রিপোর্টে দেখছি এগারোজন। তা হলে কি অন্য কোনও ঘর ছিল?

–থাকতেও পারে, সাহেব। আমাগো তো কিছু দ্যাখতে দিত না। তবে মাঝে-মাঝে অইন্যদের নামার আওয়াজ পাইতাম।

–তোমাদের খাবার দিত একজন স্ত্রীলোক? তার চেহারা কীরকম?

অনেক কাচের চুড়ি ছিল দুই হাতে।

–সে কথা তো শুনেছি। চেহারা কীরকম, রোগা না মোটা?

–মোটা। তা ছাড়া তার হাতের একখান থাবড়া খাইলে কান ঝাঁঝাঁ করত।

–কেন, মারত কেন?

সাহেব, মানুষে-মানুষরে কেন মারে, তা কি বোঝা যায়? কেউ-কেউ মেরেই আনন্দ পায় বোধহয়। মেয়েমানুষও মেয়েমানুষকে মারে, কোনও দয়া-মায়া নাই। ভগবান জানেন, আমি তার কাছে কোনও দোষ করি নাই, তবু একদিন যেই হিন্দিতে একটা গালি দিয়েছি আমার মুখে থাবড়া মেরেছে। একবার তার হাতের এক খান চুড়ি ভেংগে আমার গালে ফুইটে গেল।

–তার কি একটা চোখ নষ্ট ছিল?

–ঠিক। আপনে জানলেন কী করে সাহেব? ঘোলা-ঘোলা চক্ষু একটা।

–তার নাম জানকী। ফাইলে লেখা আছে। সে ধরা পড়েছে। তোমাদের সে মারত বটে, কিন্তু সে আসলে খুব ভীতু। পুলিশ তাকে ধরার পর একটু ভয় দেখাতেই সে সব স্বীকার করেছে। সে কয়েকজনের নামও বলল, তাদের মধ্যে সরিফনের নামও আছে। কিন্তু তোমার নাম নেই।

আমারে ভুলে গেছে?

–আমি চেষ্টা করছি ওই জানকী বাই-কে কলকাতায় আনাবার। তখন তুমি ওকে আইডেন্টিফাই করতে পারবে। ওঃ হো, তুমি তো আগেই পালিয়েছিলে। তাই বোধহয় ও তোমার নাম বলেনি। পালাবার কথা তোমার মনে এল কী করে?

–যেদিন ওই মাগিটা অমনভাবে মারল, সেইদিনই মনে হল, এই ভাবে বাঁচার চেয়ে মরাও ভালো। যেমন ভাবেই হোক এখান থিকা পলাব। পলাতে গিয়ে যদি ধরা পড়ি, তখন যদি একেবারে মাইরা ফেলায় তো ফেলুক। সেইদিন আবার সন্ধ্যা থেকে খুব বৃষ্টি।

–তুমি কী করে পালালে, পাহারা ছিল না?

দুপুরবেলা, চম্পা, সে আমার পাশে শুইত, সে কইল, দিদি আর পারতেছি না, যেমন ভাবে তোক আমি পালাবই পালাব। আমি তো সঙ্গে-সঙ্গে উঠ্যে বসে কইলাম, যাবি? আর কেউ বাংগালি ছিল না, তাই আমাদের বাংলা কথা বোঝে নাই। দুই জনে শলা করলাম। সন্ধ্যার সময় যখন একবার বাইরে আনল, তখন তো অত বৃষ্টি, আমি ভিতরে না গিয়া গোসল ঘরেই বসে রইলাম। পাহারাদারনি খেয়াল করে নাই।

–সেই গোসলঘর থেকেই বাইরে বেরিয়ে যাওয়ার উপায় ছিল।

–চম্পারে তো ভিতরে ঢুকায়ে দিয়েছে। তারে তো নিতে হবে। আমি মড়ার মতন নিশ্বাস বন্ধ করে খাড়ায়ে ছিলাম। সেখানে আবার বড়-বড় ব্যাঙ, থপথপ করে লাফায়। প্রথমে ভেবেছিলাম সাপও আছে বুঝি। যখন আর কোনও শব্দ শুনি না বাইরে, তখন চম্পারে বাইর করলাম ঘর থেকে। শেষ রাত্তিরে। সবাই যখন ঘুমায়ে। দরজায় তালা, কিন্তু চাবি কোথায় থাকে জানতাম। ঘুটঘুট্টি অন্ধকার রাস্তা। ঘেউ-ঘেউ করে কুকুর ডাকে। তার মধ্যেই দৌড়, দৌড়। চম্পা একবার আছাড় খেয়ে পড়ল, আমি হাত ধরে উঠালাম। অনেকখানি দৌড়াবার পর দেখি একটা বড় রাস্তা। আলো জ্বলে, গাড়ি চলে। অত রাত্তিরেও মোটা-মোটা গাড়ি যায়। একটা-দুইটা দোকানও খোলা। আলো দেখে ধড়ে যেন প্রাণ এল। আমরা মুক্ত হয়ে গেলাম।

তোমরা মুক্তি পেয়ে গেলে?

জি, মুক্তিই তো। কেউ আমাদের ধরতে আসে নাই। একটা দোকানে জিলাপি ভাজা হচ্ছিল, আমরা জিলাপি খেলাম। কেউ কিছু বলল না। কী অপূর্ব সোয়াদ সেই জিলাপির।

পয়সা পেলে কোথায়? তোমাকে ওরা টাকাপয়সা কিছু দিত?

না। কিন্তু চম্পার কাছে লুকানো কিছু টাকা ছিল। দলা পাকানো কাগজের টাকা। আমরা প্যাট ভরে খেলাম। পানি খেয়ে প্রাণ জুড়াল। তখন কী করি? ভোর-ভোর টাইম, সেই দোকানের সামনেই একটা বাস থামল। উঠে পড়লাম সেই বাসে। আর ভয় নাই।

সেই বাসে আরও লোক ছিল?

অনেক মানুষ। মানুষ ওঠে, মানুষ নামে। আস্তে-আস্তে সকাল হয়ে গেল বাসের টিকিটওয়ালা টিকিট কাটতে কইলে চম্পা দিল একটা দশটাকার নোট। সে আরও দুই টাকা চাইল। আরও কী সব কইল বুঝি নাই। তারপর সেই বাস একখানে থামতেই টিকিটওয়ালা আমাদের কইল, উতারো, উতারো। আমরা নেমে গেলাম। সেটা একটা বাজার। সেখানে এক দোকানে আবার আমরা পুরি আর হালুয়া খাইলাম।

বেশ। অনেকদিনের খিদে জমে ছিল। তখন কি তোমরা বাড়ি ফেরার কথা ভেবেছিলে?

বাড়ি ছাড়া আর কোথায় যাওয়ার কথা ভাবব? লাখু আর বেলির কথা মনে পড়ছিল সর্বক্ষণ।

তারা কে?

আমার ছেলে আর মেয়ে।

আগে যে বলেছিলে, তাদের নাম, এই যে লেখা আছে রতন আর সরস্বতী?

সে তো ভালো নাম। ডাকনামই মনে আসে। মনে আসতেই কান্না পায়। জিলাপি খাওয়ার সময়েও ওদের মুখ মনে করে কান্না পেয়েছিল।

বাড়ি ফেরার কথা ভেবে ভয় করেনি?

কেন, ভয় করবে কেন? নিজের সোয়ামির বাড়ি যাব, তাতে ভয় কীসের? কতক্ষণে পৌঁছব। এইসময় সাহেব একটা অদ্ভুত প্রাণী দেখলাম। অমন আগে জীবনে কখনও দেখি নাই। গাড়ি টানে, গরুও না, ঘোড়াও না। লম্বা গলা, মুখোন ছোট্ট, এদিক-ওদিক ঘুরায়।

বুঝেছি। উট। ওই সব অঞ্চলে এখনও উটে গাড়ি টানে। হাতি দ্যাখোনি? ওসব দিকে রাস্তা দিয়ে পোষা হাতিও যায়।

উট? ওরা মানুষকে কামড়ায়?

না! বাড়ি যাওয়ার কথা যে ভাবলে, একবারও কি মনে হল না যে ফিরতে পারলেও বাড়িতে তোমাদের আর ঠাঁই হবে না। এতগুলো দিন বাড়ির বাইরে ছিলে, পরপুরুষের সঙ্গে রাত কাটিয়েছ, তারপর কি বাড়ির লোক ফেরত নেয়?

কেউ তো কিছু জানে না।

জানার দরকার হয় না। বাড়ির বাইরে এক রাত্তির থাকলেই মেয়েদের জীবন নষ্ট হয়ে যায়। পুরুষরা মাঝে-মাঝেই বাড়ির বাইরে রাত কাটাতে পারে। তাতে তাদের দোষ হয় না।

এটা ভগবানের কী রকম বিচার?

তা তো আমি বলতে পারব না। ভগবানের সঙ্গে যদি তোমার কখনও দেখা হয়, তাঁকে তুমিই জিগ্যেস কোরো।

হা আমার পোড়া কপাল! আমার মতন অভাগিনীর কাছে কি আর ভগবান দেখা দেবেন! আমি যে পাপ করেছি।

কী পাপ করেছ?

আপনিই যে বললেন, বাড়ির বাইরে রাত কাটিয়েছি, তাতে আমার পাপ হয়েছে। জীবন নষ্ট হয়ে গেছে।

না, আমি তোমার পাপের কথা বলিনি। পাপ-পুণ্যের বিচার করার অধিকার আমার নেই। আমি শুধু বলেছি, আমাদের দেশের মেয়েরা বাড়ির বাইরে রাত কাটালে সমাজ তা মেনে নেয় না। মেয়েদের কোনও দোষ না থাকলেও বিবাহিত মেয়েদের স্বামী, শ্বশুরবাড়ির লোকেরা আর তাকে ক্ষমা করে না।

ওগো বাবু, তোমায় পাড়ে পড়ি, আমাকে একবার আমার সোয়ামির কাছে ফিরিয়ে দাও। তিনি ভালোমানুষ, তিনি আমায় ঠেলবেন না। তিনি তো আমার ছেলেমেয়েদেরও বাপ।

সে ব্যবস্থা করব নিশ্চয়ই। মুনসিগঞ্জে খোঁজখবর নেওয়া হচ্ছে। তুমি তোমার স্বামীর নাম বলতে পারোনি। বিরাজ নামেও কারুর সন্ধান এখনও পাওয়া যায়নি। জলিল শেখের বউ সরিফন বিবির কথা সেখানকার লোক জানে। আর কার বউ হারিয়ে গেছে জানা যাচ্ছে না।

আমারেও সেখানে নিয়া চলেন। আমি বাড়ি চিনি, একটা মস্ত বিশাল অশত্থ গাছ, যার মগডালে শকুন বসে, সেইখানে পুকুড়ের পাড়ে...।

ব্যস্ত হোয়ো না। সেখানে তোমাকে নিয়ে যাওয়া হবে নিশ্চিত। আগে ভালো করে সব খবরটবর নেওয়া হোক। কঁসি থেকে তোমরা তো পালালে, আবার ধরা পড়ে গেলে কী করে?

ধরা ঠিক পড়ি নাই। আমরা দুইটি মেয়ে, কিছুই চিনি না, ওইখানকার ভাষাও ঠিক ঠিক বুঝি না, কোথায় আছি তাও জানি না। রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরে বেড়াই। দিনের বেলা, ঠিক ভয় লাগে না। সব মানুষ তো আর খারাপ না। সেইজন্যেই তো চন্দ্র-সূর্য এখনও ঘোরে। অনেককে জিগ্যেস করি, কেউ কিছু বোঝে না। একটা দিন কেটেই গেল।

রাত্তিরে থাকলে কোথায়?

একটা মন্দিরের চাতালে। আরও মানুষ শোয় সেখানে। ভয়ের কিছু নাই। খুব নিকটেই একটা নদী। ছোট নদী। অনেকখানি শুকনা। সেখানেই গোসল করলাম সকালে।

ওখানে বৃষ্টি পড়েনি?

মাঝে-মাঝে পড়তেছিল, ভিজেওছি।

পরপর কয় রাত্তির তো ঘুমালাম সেই মন্দিরের চাতালে। দিনের বেলা এদিক-ওদিক যাই, নদীর ধারে বসে থাকি। সময় আর কাটে না।

–খাবার পেতে কোথায়?

সন্ধ্যার সময় মন্দিরে প্রসাদ দিত। সেই প্রসাদ খাওনের লোভেই অনেক মানুষ আসত সেখানে।

কী ছিল প্রসাদ।

–চিড়া কিংবা খই, দই আর কলা দিয়ে মাখা। তাই দিত এক দলা। খুব ভালো সোয়াদ। আর কয়েকখান বাতাসা।

–শুধু একবেলা ওই প্রসাদ খেয়ে পেট ভরত?

–তা কি আর ভরে? পোড়া প্যাট! প্যাটের জ্বালাতেই তো এত কাণ্ড! চম্পার কাছে আরও কিছু পয়সা ছিল। দিনের বেলা কেনতাম কয়েকখান রুটি। সন্ধ্যাবেলা প্রসাদের সঙ্গে যে বাতাসা দিত, তাই জমাইয়া রাখতাম আঁচলে বেন্ধে, দিনের বেলা সেই বাতাসা দিয়া রুটি খাইতাম। পানি তো বিনা পয়সাতেই পাওয়া যায়।

–এইভাবে আর কতদিন চলে?

–ছিলাম মন্দ না। একটা কোনও কামকাজ পাইলে বড় ভালো হত, কিন্তু দু-একটা দোকানে গিয়া জিজ্ঞাসা করেছি, পাত্তা দেয় নাই। তা ছাড়া সেই মন্দিরের চাতালও আমাদের ছাড়তে হল।

–কেন?

–বাবু, কী কবো লজ্জার কথা। বাবা বিশ্বনাথের মন্দির, কত পবিত্র স্থান, দিনমানে কত মানুষ এসে ভক্তিভরে পেন্নাম করে। আর রাত্তিরে সেখানেই ছিছি, কত পাপ হয়। যাদের বাড়ি-ঘর নাই, সেরকম কয়েকজন পুরুষ সেখানের চাতালে শোয় রাত্তিরে, আমাদের মতন কয়েকজন অভাগিনীও শোয় একটু দূরে। তাও বাইরে থেকে পুরুষরা এসে আমাদের টানাটানি করে। উঠানে নিয়ে যেতে চায়। তারা ফিসফাস করে, জোরে কথা কয় না। আমরা ভাগ যাও বললে পলায়। শিয়ালের মতন। দুই-তিন রাত্তির তো গেল এমন ভাবে। পরের মাঝ রাইত্তে হঠাৎ ঘুম ভেংগে দেখি, চম্পা আমার পাশে নাই। আমার মাথায় যেন আকাশ ভেংগে পড়ল। কী কবো আপনারে বাবু, এমন অসহায় লাগতে ছিল। দুইজনে এক সঙ্গে থাকলে মনে তবু বল-ভরসা থাকে। কিন্তু একা! দুই চক্ষু ফেটে কান্না এসে গেল। অনেকক্ষণ বসে-বসে কান্দলাম। শ্যাস রাত্তিরে চম্পা ফিরে আসল। চুপিচুপি শুয়ে পড়ল আমার পাশে।

চম্পা একাই ফিরে এল? কেউ তাকে জোর করে ধরে নিয়ে যায়নি?

না। ওই যে কইলাম, কেউ এসে ডাকে। ও যখন ফিরে আসল, আমি তো তখনও জেগেই আছি। আমি তারে কইলাম, হারামজাদি, তুই কোথায় গেছিলি? সে বলল, দিদি, আমরা তো নষ্ট হয়েই গেছি। আমাগো জাত-ধর্ম সব গেছে, আমরা পতিতা। এখন আর চক্ষুলজ্জা করে লাভ কী? কোনওরকমে ক্ষুধার জ্বালা তো মিটাতে হবে? আমার কাছে যা টাকা আছে, তাতে আর কয়দিন চলবে? টাকা রোজগার ছাড়া উপায় নেই। এক লোকের সঙ্গে গেলাম, সে আমারে কুড়ি টাকা দিছে।

একথা শুনে আমার গা জ্বলে গেল! আমরা নষ্ট হয়েছি, সে কি নিজের ইচ্ছায়? শিবঠাকুরের কিরে আমি একবারও সাধ করে কোনও পর পুরুষের পাশে শুই নাই। পুরুষ যদি জোর করে, আমরা মেয়েমানুষ, গায়ের জোরে তো পারি না, তখন বাধ্য হয়েই...। নিজে ইচ্ছা করে যে মেয়েমানুষ অন্য পুরুষ মানুষের কাছে যায়, সেই তো বেবুশ্যে। আমি মরে গেলেও তা হতে পারব না।

চম্পা কী বলল?

কিছুক্ষণ তর্ক হল তার সঙ্গে। শেষে আমি কইলাম, তোর যা ইচ্ছা কর। আমি আর তোর টাকায় খাব না। আমি ভিক্ষে করে খাব, তাই সই। তুই আর আমার সঙ্গে কথাও কইবি না।

চম্পা কিন্তু আমাকে ছাড়তে চাইল না। সে বলল, ঠিক আছে, আমারে মাপ করে দাও। আমি আর যাব না কাউর সঙ্গে। পয়সা ফুরায়ে গেলে আমরা দুইজনেই ভিক্ষা করব।

অবশ্য ওই মন্দিরের চাতালে শোওয়ার পাটও আমাদের চুকে গেল পরদিনই। আবার রাত্তিরে এসে যে-ই শুয়েছি, অমনি লাঠি হাতে একজন পাহারাদার এসে চক্ষু রাঙিয়ে বলল, হেই, তোরা উঠে যা। তোদের এখানে শোওয়া চলবে না। রেন্ডিদের এখানে জায়গা নেই। কী আর করি, সে রাত আমরা কাটালাম নদীর ধারে।

পরের দিন থেকে আবার কোথায় গেলে?

আবার পথে-পথে ঘুরি। তারপর আশ্চর্য না আশ্চর্য। সেই বিভূঁইয়ে এক দিদিকে পাইলাম, সেই দিদি একটু-একটু বাংলা জানে। ট্যাপাটুপা চেহারা, খুব ফরসা রং, মাথার চুল কেঁকড়া, চোখে সোনার চশমা, খুব লিখাপড়া জানে মনে হয়। হাতে দুইখান মোটা বই। আমাদের কথা শুনে বললেন, বাঙালি? এখানে কী করছ? আমি কলকাতায় চাকরি করেছি অনেকদিন। আমি খুব ব্যস্ত আছি, এখনি দিল্লি যেতে হবে, নাহলে তোমাদের নিয়ে যেতাম আমার বাড়িতে। জানেন সাহেব, সেই দিদি যদি সেইদিনই দিল্লি না যেতেন, আর একটা দিনও থাকতেন, নিশ্চয়ই সাহায্য। করতেন আমাদের। তা হলে আমাদের জীবনটাই অন্যরকম হতে পারত। একটা গাড়িতে ওঠার সময় দিদি কইলেন, কইলকাতায় ফিরতে চাও তো রেল স্টেশানে যাও, কিংবা এই রাস্তার ডাইনদিকে একটুখানি গ্যালেই থানা, সেই থানায় গিয়া সাহায্য চাও। তারা সাহায্য করবে। আমরা রেল স্টেশানেই গেলাম।

থানায় গেলে না কেন?

ছোটবেলা থেকেই তো পুলিশের নাম শুনলে ভয় করে। পুলিশ তো খালি পয়সা চায় কিংবা মারে। পুলিশ কি কারুরে সাহায্য করে?

সব পুলিশই পয়সা চায় না, মারেও না। মানুষকে সাহায্যও করে।

তবু স্যার পুলিশ দেখলেই ভয় লাগে।

আমাকে দেখেও ভয় পেয়েছ নাকি?

আপনিও পুলিশ?

হ্যাঁ, পুলিশই তো!

ভদ্দরলোক বাবুদের মতন পোশাক পরে আছেন যে!

পুলিশের পোশাক দেখলেই তা হলে ভয় লাগে? আসলে কিন্তু পুলিশরাও মানুষ। সব মানুষের মধ্যেই তো ভালো আর খারাপ আছে। থানায় গেলেও হয়তো তোমাদের জীবনটা বদলে যেতে পারত। যাই হোক, রেল স্টেশানে গিয়ে কী হল?

রেলের তো টিকিট কাটতে হয়। কইলকাতার টিকিট কাটতে গিয়ে শুনি যে চারশো টাকা লাগবে। দুইবার বদল করতে হবে। চম্পার কাছে ছিল মোটে সাতাশ টাকা। আমার সোয়ামি আমাকে পাঁচ টাকা দিয়েছিল, সে টাকাও কখন কে নিছে জানি না। অত টাকা নাই, কী করে যাব? কী করি, চক্ষে পানি এসে গেল।

রেল স্টেশানে দাঁড়িয়ে দুজনে কাঁদতে আরম্ভ করলে?

চম্পা কাঁদে নাই। সে শক্ত মেয়ে। আমিই পারি না।

ভিড় জমে গিয়েছিল?

জি। তখন সাফলদির মতন একজন মেয়ে মানুষ বলল, এখানে কেন্দে কী করবে? রেল। তো কান্না দেখলে দয়া করে না। আমার সঙ্গে চলো, আমি একটা ব্যবস্থা করে দেব।

বাংলায় বলল?

না, হিন্দিতে। একটু-একটু বুঝেছি। সে আমার হাত ধরে বলল, বহিন, বহিন, চলো। কয়েক পা গেছি, কয়েকজন পুরুষমানুষ বলল, এই এই, ওর সঙ্গে যেও না। আরও বিপদে পড়বে। ওর মতলব ভালো না।

অনেক রেল স্টেশানেই দালাল ঘুরে বেড়ায়।

দালাল কী?

যারা মানুষ কেনাবেচা করে।

একজন পুরুষমানুষ এসে বলল, ওর সঙ্গে যেও না। কাজ করে টাকা রোজগার করো। সেই টাকায় রেলের টিকিট কাটতে পারবে। নইলে এমনি-এমনি তোমাদের টাকা কে দেবে? চম্পা তখন কইল, আমরা কাজ করতে রাজি আছি। যে-কোনও কাজ। সে লোকটি বলল, চলো আমার সঙ্গে।

কী কাজ দেবে, জিগ্যেস করোনি?

ইটভাটার কাজ। খাওয়া দিবে, থাকার জাগা দিবে, আর বিশ টাকা রোজ। তাই গেলাম। মানুষটা সত্যিই ভালো। সেখানে কেউ আমাদের কষ্ট দেয় নাই। খাওন-দাওন ভালো ছিল।

কী খেতে দিত?

একবেলা ছাত্তু আর একবেলা রুটি। ওরা ভাত খায় না। পাকা কলা দিত, আর গুড়, এক একদিন দই। মাছও খায় না। আচার খায়, মরিচের আচার।

থাকার জায়গা, ওই ইটভাটার মধ্যেই? তোমার আর চম্পার এক ঘর?

না, চম্পার ঘর একটু দূরে। মস্ত বড় জাগা, চতুর্দিকে শুধু ইট।

কত টাকা পেতে কাজের জন্য?

টাকা দিত। চাইরশো পাঁচ টাকা জমেছিল।

দুজনের?

না, আমার একার।

তাতেই তো রেল ভাড়া কুলিয়ে যেত। তখনই চলে এলে না কেন?

ওই ইটভাটার কাজ বর্ষা পর্যন্ত চলে। কাজ শেষ না হলে আসতে দেবে না। হাতে হাতে টাকা পেতাম, ভালো লাগছিল সাহেব।

হুঁ, টাকা পেয়ে ভালো লাগছিল। তখন আর ছেলেমেয়ের কথা মনে পড়েনি। একটা গণ্ডগোল না হলে ওখানেই আরও অনেকদিন থেকে যেতে, তাই না?

না, না, সাহেব, বাড়ির জন্য সব সময় মনটা ছটফট করত। রোজ বিকালে রোদ্দুর পড়ে এলেই মনে হত, কবে বাড়ি যাব, কবে বাড়ি যাব!

বাড়ির জন্য মন কেমন করে, আবার অন্য একটা জায়গায় থাকতেও ভালো লাগে। দুটোই একসঙ্গে হতে পারে। তা ছাড়া লোকটি ভালো ছিল। অত্যাচার করত না, তাই না? লোকটির নাম মনে আছে?

এই কয়মাসে কত মানুষই তো দেখলাম অনেকেরই নাম জানি না। এই লোকটির নাম মনে আছে, সূরয। লম্বা-চওড়া মানুষ, গলার আওয়াজ বাঘের মতন, কিন্তু মনটা নরম।

তাকে তোমার বেশ পছন্দ হয়েছিল মনে হচ্ছে। তোমার স্বামীর চেয়েও সে পুরুষমানুষ হিসেবে ভালো?

ছি-ছি, একী কথা বলছেন সাহেব! নিজের সোয়ামির সঙ্গে কি অন্য কোনও পুরুষের তুলনা হয়? তার সঙ্গে তো আমার সেরকম কোনও সম্পর্ক ছিল না।

এই তো আবার মিথ্যে কথা শুরু করলে। ওই সূযের সঙ্গে প্রতিটি রাত তুমি একসঙ্গে কাটাতে। প্রথম দু-একদিন কান্নাকাটি করেছিলে বোধহয়? তারপর মেনে নিয়েছিলে? ভালো লাগতে শুরু করেছিল, তাই না? জীবনে যদি একজনের বেশি পুরুষ আসে, তা হলে মনে মনে একটা তুলনাও তো আসবে। সূর্যকে কি তোমার বেশি ভালো লেগে গিয়েছিল? হঠাৎ কাঁদছ কেন, এরমধ্যে কান্নার কী আছে?

সূরয সত্যিই ভালো, কিন্তু সে তো আমার ছেলেমেয়ের বাপ নয়। ধর্ম সাক্ষী করে সোয়ামি হয়।

সূরযের সঙ্গে তুমি আরও কিছুদিন থাকতে রাজি ছিলে। সেখানে সুখী ছিলে সবদিক দিয়ে। কিন্তু নিয়তি তোমাকে থাকতে দিল না।

আপনে জানলেন কী করে?

তুমি যেখানে ছিলে, যেখানে ইটভাটা, সে জায়গাটার নাম ওরছা। সেখানে কয়েকমাস আগে একটা বড় রকমের দাঙ্গা হয়েছিল। পাঁচজন মারা যায়। দাঙ্গার পর পুলিশ ডিটেইলড তদন্ত রিপোর্ট তৈরি করে। মধ্যপ্রদেশ সরকার সেই তদন্ত রিপোর্টের কপি পাঠিয়েছে আমাদের। কাছে, ইটভাটার মধ্যে প্রত্যেক দিন সন্ধের পর মেয়েদের নিয়ে ফুর্তি আর মদ্যপান হত। সূর্য তোমাকে আলাদাভাবে রক্ষিতা করে রেখেছিল, কিন্তু অন্য মেয়েরা আসত। তোমার সেই চম্পার কী হল?

জানি না, আর তাকে দেখি নাই।

সেই দাঙ্গার রাত্তিরে তুমি কী করলে?

সাহেব, ভাবতে গেলেই আমার এখনও শরীর কাঁপে। এই দেখেন। উফ! আমি ঘরে বসে ছিলাম। একসময় শুনি খুব চাঁচামেচি। ওরা এক জায়গায় আগুন জ্বেলে গোল হয়ে বসে। ওইসব মদ-মুদ খায়। আমাকে দু-একবার জোর করে খাওয়ানোর চেষ্টা করেছে, কিন্তু গন্ধেই আমার বমি আসে। খাই নাই কখনও। আমি ঘরে বসে রুটি পাকাচ্ছিলাম, অন্যদিনও চিল্লামিল্লি হয়, সেদিন যেন খুব বেশি। ঘর থেকে মুখ বার করে দেখি, ওরে সব্বনাশ, লোকজন মশাল নিয়ে ছুটাছুটি করছে, কয়েকজনের হাতে খোলা তরোয়াল, কতকগুলোন মেয়ে ভয়ে চিল- চিৎকার করছে। মা গো মা। আমি আবার ঘরের মধ্যে সিঁধোতে যাব, দেখি যে সেদিকেই ছুটে আসছে সূর্য। কী যেন বলছে আমাকে, আমি হঠাৎ বুঝিনি। খুব কাছে আসার পর হঠাৎ পিছন থেকে দুইজন শয়তান লাফিয়ে পড়ল তার

ওপরে, তার ঘাড়ে কোপ মারল। আমি তখন ছুটে গিয়ে দেখি, সূর্য মাটিতে পড়ে কাটা পাঁঠার মতন ছটফট করছে। আমার তো দম বন্ধ হওয়ার জোগাড়। আমি মাটিতে বসে পড়ে সুরযের মাথাটা কোলে তুলে নিলাম। তখনও সে বেঁচে আছে কি না জানি না। এইসময় কেউ আমার মাথায় মারল। আমি চক্ষে অন্ধকার দেখলাম। আর কিছু মনে নাই।

রিপোর্টে সূরয সিং-এর নাম আছে। সে ওখানেই মারা গেছে। তার নামেও একটা খুনের অভিযোগ ছিল।

জলজ্যান্ত মানুষটা আমার চোখের সামনে..উঃ উঃ, এখনও যেন বিশ্বাস হয় না। তাগড়া জওয়ান ছিল মানুষটা। আচ্ছা, ওরা আমাকেও এক্কেবারে মেরে ফেলল না কেন?

এইসব হাঙ্গামার সময় মেয়েদের পারতপক্ষে খুন করে না। ধর্ষণ করে, লুঠ করে নিয়ে যায়। তোমার ক্ষেত্রে কি দুটোই হয়েছিল?

জানি না।

তোমার বয়েসি মেয়েদের, যদি স্বাস্থ্য-টাস্থ্য ভালো হয়, বাজারদর আছে, চাহিদা আছে। তোমার বয়েসি পুরুষদের তো চাহিদা নেই, তাই তারা খুন হয়। মরে কিংবা মারে। সমাজের নীচের তলায় এটা অনবরত চলছে। ওপর তলায় তা ঠিক বোঝা যায় না। তারপর তোমার জ্ঞান হল কোথায়?

একটা ঝুপড়ির মধ্যে। মাথায় কী ব্যথা, কী ব্যথা। সারা গায়ে ব্যথা। চোখ মেলেই আমি ব্যথার চোটে মা, মাগো বলে কান্দতে লাগলাম।

তোমার মা মারা গেছেন অনেকদিন আগে, তাই না? তবু দুঃখের সময় মায়ের কথাই মনে পড়ে। তোমার বাবা কোথায়?

বাবাও চলে গেছেন অনেকদিন আগে।

ভাইবোন কে কোথায় জানো?

একখান ভাই আর ছয় বোন। জানি না, একটা বোন সাপের কামড়ে মরেছিল, কিংবা মরেনি, তাকে কলার ভেলায় জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছিল, হয়তো সে বেঁচে উঠেছে, কোথাও সে আছে।

সেই ঝুপরিতে কতদিন রইলে?

একদিন না দুইদিন। কিছু খেতে দেয় নাই। বৃষ্টির পানিতে ঘর ভেসে গেল, কেউ আসে নাই। তারপর আমার জ্বর হল। ধুম জ্বর। ঘরের মধ্যে ভিজা চটের ওপর শুয়ে-শুয়ে কোকাই, কেউ শোনে না। খালি ভাবতাম, আমার মরণ হয় না কেন? সাহেব, মেয়েমানুষের জান, সহজে যায় না। আবার ভাইগ্যও এমন, এই কয়দিন মাথার যন্ত্রণা আর জ্বরে কষ্ট পাই, পেটে ভাত নাই, আর তার পরের দিনই কারা যেন আমায় গাড়ি করে নিয়ে গেল, ওষুধ দিল, দুধ-পাউরুটি খেতে দিল। কত খাতির! নতুন শাড়ি-বেলাউজও দিল।

অর্থাৎ তুমি অন্য জায়গায় বিক্রি হয়ে গেলে। এক হিসেবে তোমার ভাগ্য ভালোই বলতে হবে, কারণ আঁসিতে যে ডেরায় মেয়েদের রাখা হয়েছিল, তারা সবাই পাচার হয়ে গেছে আরব দেশে। তুমি আর চম্পা পালিয়ে গিয়েছিলে বলে বেঁচে গেলে। আরব দেশে একবার পাচার হলে আর ফিরিয়ে আনা যায় না। চম্পার আর খোঁজ পাওনি?

না, সাহেব।

এবার তোমায় কোথায় নিয়ে গেল, জানো না?

না।

এর পরের রিপোর্টে সেসব স্পষ্ট করে লেখাও নেই। তোমার পেটে যে বাচ্চাটি এসেছিল, সেটা কোথায়? ওই সূরয সিং-এর সঙ্গে থাকার সময়? অ্যাবরশানের সময়, মানে

গর্ভপাত, গণ্ডগোল হওয়ায় খুব খারাপ অবস্থায় একটি মেয়ে হাসপাতালে ভরতি হয়েছিল, নাম দেওয়া হয়েছিল কমলা, সে আবার দুদিন পরে ভালো করে সুস্থ হওয়ার আগেই হাসপাতাল থেকে পালায়। আমি ধরে নিচ্ছি, লক্ষ্মী আর কমলা একই। সূরযই তোমাকে ভরতি করা আর পালাবার সাহায্য করেছিল?

সূরয আমায় খুব যত্ন করত।

অর্থাৎ বাকিটা স্বীকার করবে না। সূর্য তোমাকে কী বলে ডাকত?

লছমী। আবার এক এক সময় নেশা করে নাম ভুলে গিয়ে বলত কমলা।

তা হলে তো ঠিকই আছে। এরপর তোমাকে যেখানে নিয়ে যাওয়া হল, সে জায়গাটারও তুমি নাম জানো না? ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে গিয়েছিলে। দিনের বেলা? আবার পান খেয়েছিলে?

রাগ করবেন না সাহেব। সূরয আমাকে গাঁজার নেশা ধরিয়েছিল। গাঁজা খেলে সব দুঃখ-কষ্ট ভুলে যেতাম। কেউ গাঁজা দিলে না বলতাম না।

গাঁজা খেয়েছিলে। তারপর যে বাড়িতে উঠলে, সে বাড়িটা কেমন?

ওরে বাপ রে, অমন ভালো বাড়িতে জীবনে থাকি নাই। তিনতলা। সাদা পাথরের মেঝে। কত রকমের বাতি। পাখা ঘোরে। ঠান্ডা মেশিন। ফ্রিজ বলে, তাই না?

সেখানে একটা ঘর পেলে?

নিজের ঘর না। একতলার একটা লম্বা ঘরে পাঁচজন। দুতলা আর তিনতলার এক একখানা ঘরে যারা থাকে, তারা সব বাবুদের বাড়ির মেয়েদের মতন। ফরসা ফরসা, চুল ছোট, ভুরু আঁকা। কেউ আবার গানও গায়। আর নীচের তলায় আমরা পাঁচজন উনাদের এক-একজনের দাসী। আমাকে যেনার সঙ্গে জুতে দিল, তার নাম জানেমন। এক্কেবারে হুরী-পরির মতন রূপ। টানা টানা চোখ। কিন্তু ম্যাজাজটা খুব খারাপ। মাঝে-মাঝে আমার

পাছায় লাথি মারত। প্রথম দিনই আমার লক্ষ্মী নামটা শুনে মুখ ভেটকি দিয়ে বলেছিল, এখানে ও নাম চলবে না। তোর নাম, তোর নাম হল পিয়ারা। তারপর থেকে সবাই সেই নামেই ডাকত। সে বাড়িতে কয়েকজন বাঙালিও ছিল।

সেখানে তোমার কাজটা কী ছিল?

দিনের বেলা জানেমনদিদির গতর টিপে দিতাম। চুল বেঁধে দিতাম। পান সেজে...আর সন্ধেবেলা ঘরে বাবুরা এলে গেলাস দিতাম, সোটা আর পানি, কিছু খাবারও এনে দিতে হত। এইসব...

অর্থাৎ খিদমদগারি ছাড়া আর কিছু করতে হত না?

না।

ঠিক বলেছ?

জি।

শরীর ব্যবহার করতে হয়নি?

না।

বলেছি না, আমার কাছে মিথ্যে কথা বলে লাভ নেই। এখন আর লুকিয়ে কী হবে? পুরুষের সঙ্গে শুতে হত না?

দুইটা তাগড়া জোয়ান পাহারাদার ছিল, একটার নাম বাঘা। সে এক- একদিন নেশার বেঁকে তার ঘরে জোর করে টেনে নিয়ে যেত। আর দিদির ঘরে যেসব বাবুরা আসত, তাদের মধ্যে দুই-তিনজন, এমন সব অদ্ভুত কাণ্ড করত, ছি-ছি-ছি, সেসব কথা আমি মুখে উচ্চারণ করতে পারব না, আমারে মাপ করেন সাহেব।

ঠিক আছে, বলতে হবে না। সেখানে মোটকথা খেয়েপরে ভালোই ছিলে?

খাওয়া-পরা ভালো, কিন্তু সবসময় মন উচাটন করত ছেলেমেয়ের কথা ভেবে।

এই সময় ছলছল করে উঠল লক্ষ্মীমণির চোখ।

চোখে আঁচল চাপা দিয়ে সে থেমে রইল একটুক্ষণ।

তারপর আবার ধরা গলায় বলল, ছেলেমেয়ের কথা মনে পড়লে আত্মাটা বড় ছটফট করে গো বাবু! টনটন করে। সে বাড়িতে প্রায় দিনই মাংস খেতাম। জানেমন দিদির ঘরে যে সব বড়-মানুষরা আসত, তারা প্রায় দিনই পকেট থেকে ফসফস করে বড়-বড় টাকার নোট বার করে হুকুম দিত, দোকান থিকা মাংস আনাও। কাবাব লাও! বিরিয়ানি লাও! অনেক মাংস আনানো হত। আর সেই বাবুরা বোতল-বোতল মদ খেয়ে লটপটিয়ে যেত, সেই মাংস আর তাদের মুখে রোচত না। ঠেলে সরিয়ে দিত। পরে আমরাই তো খাইতাম সেই মাংস-টাংস। যেমন সোন্দর গন্ধ আর তেমন সোয়াদ। খাইতাম আর চক্ষে জল আসত। মনে হইত, আমার ছেলেমেয়ে দুটা কী খায় কে জানে! তারা কি কখনও মাংস...বাবু, নিজের আপন মানুষজনের সঙ্গে বসে যে খাইদ্যাই একসঙ্গে ভাগ করে খাওয়া যায়, সে-ই তো অমৃত। তা নুন-পান্তা হলেও যথেষ্ট।

তা ঠিক। শোনো, একটা ব্যাপার পরিষ্কার বুঝেনি। দিল্লিতে তোমরা যে বাড়িটায় থাকতে, সেটা একটা তিনতলা বাড়ি। তার দোতলা, তিনতলায় এক-একখানা ঘরে থাকত এক-একজন দামি স্ত্রীলোক। বাবুরা আসত তাদের কাছে। আর তোমরা কয়েকজন থাকতে একতলায়। তোমাদের মোটামুটি চাকরানির কাজ করতে হত। এই তো?

না, সাহেব। একটু ভুল বলেছি। ওই পাকা বাড়ির নীচের তলায় আমরা থাকতাম না। বাড়ির সঙ্গে একটুখানি বাগান ছিল, সেই বাগানের মধ্যে দুই-তিনখান টালির ঘর। আমি আর দুই-তিনজন চাকরানি সেই টালির ঘরে থাকতাম। আসল বাড়িটার অনেক ঘরই খালি থাকত। এর একতলার ঘরগুলো আমরা ব্যবহার করতে পারতাম না। দুপুর বেলা

তো বেশি কাজ থাকত না। আমরা কয়েকজন একটা ঘরে তাশ খেলতাম। ওরা আমারে তাশ খেলা শিখায়ে নিয়েছিল।

সে বাড়িতে সরিফন বলে কেউ ছিল?

জি, ছিল তো?

ছিল? আগে যে বলেছিল, সরিফন বলে কাউকে চেনো না?

আগে তো তারে দেখি নাই। এই খানেই প্রথম দেখলাম। তার ডাকনাম ছিল মুন্না, একবারই শুধু শুনেছিলাম, তার পুরা নাম সরিফনবাই।

সে কি দোতলা, তিনতলার ঘরে থাকত?

না, না, সে আমাগো মতনই চাকরানি, এর একজন দারোয়ানের সঙ্গে তার পাকাপাকি আশনাই, তাই চোপার জোর বেশি। ধরে ন্যান, সে ছিল হেড চাকরানি।

ফাইলে মুন্নারও নাম আছে। তা হলে মুন্না আর সরিফন আলাদা-আলাদা দুজন নয়?

জি না।

এই সরিফনের সঙ্গে তোমার ভাব ছিল? তোমাদের নিজেদের দেশ-গ্রামের কথা হত না কখনও?

ভাব হবে কেমন করে? আমার থিকা তার বয়েস কম। আটা-ময়দার মতন গায়ের রং। তাই জেল্লা বেশি, তার খাতিরও বেশি। সে আমারে পাত্তা দিত না।

এই সরিফন কি মারা গিয়েছিল, মানে খুন হয়েছিল?

তা আমি জানি না? কইতে পারব না?

তোমরা একই বাড়িতে ছিলে, তার কিছু হলে জানবে না কেন?

আমি তো শ্যাস পর্যন্ত থাকি নাই!

শেষপর্যন্ত মানে, কিসের শেষপর্যন্ত?

আমার সব কথা মনে নাই, স্যার।

এইরকম আবার তুমি কিছু লুকোচ্ছো মনে হচ্ছে! সে বাড়িটায় একসময় একটা সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড হয়েছিল, সে তো আমরা জানিই। ফাইলে সব লেখা আছে। তুমি তখন কী করছিলে?

সাহেব, আমারে মাপ করেন, আমার মাথা ঘুরাচ্ছে। আজ আমারে ছুটি দ্যান।

না, আজই শেষ করতে হবে। ঠিক আছে, তোমাকে আমি চাপ দিচ্ছি না। তুমি যেমনভাবে বলছিলে, সেরকম ভাবেই বলো।

পালাবার চেষ্টা করোনি?

হাতে পয়সা দিত না একটাও। কড়া পাহারা ছিল। যাবই বা কোথায়? অত যে বাঙালি মেয়েরা ছিল, তাদের কাছে পালাবার জন্য শলা করতে গেলে তারা বলত, খবর্দার, ও চেষ্টা করিস না। ঠিক ধরা পড়ে যাবি। খুব মার খাবি।

তবু পালালে কী করে?

ঠিক পলাই নাই। এক রাত্তিরে হল কী, জানেমনদিদির ঘরে দুইটা বাবু এসেছিল, আমিও সেদিন ঘরের মধ্যে বাবু দুইটা বোতলের পর বোতল শেষ করে, জানেমনদিদিরে নাচতে বলে। দিদি নাচ ভালো জানে না, আমিও জানি না, একজন বাবু একেবারে টইটুম্বুর মাতাল, আমাদের টানাটানি করে, অন্য বাবুটা হাসে, পাগলের মতন হাসে। হঠাৎ হল কী, বেশি মাতাল বাবুটা তার বন্ধুরে মারল একখান থাপ্পড়, অমনি অন্য বাবুটা পকেট থেকে ফস করে বার করল একটা ছোট্ট বন্দুক। কী সব গালাগালি দিতে-দিতে দুমদুম

করে গুলি চালিয়ে দিল বন্ধুটার মাথায়। রক্ত, ফিনকি দিয়া রক্ত, বন্দুক হাতে বাবুটা বাইরে বেরিয়ে আসল, সিঁড়ির কাছে বাঘা তার। মাথায় মারল একটা লাঠির বাড়ি, তখন আবার দুমদুম করে গুলি, আর চিৎকার, সবকই কো মার ডালুঙ্গা! আমরা যে যেমন ছিলাম দৌড় দিলাম, দিক-বিদিক জ্ঞান নাই। একসময় একটা পুলিশের গাড়ি আমারে থামাল। তখন ভাবলাম খাইসে, এবার পুলিশের পাল্লায় পড়ছি, আর বাঁচুম না।

কিন্তু এবার পুলিশই তোমায় বাঁচিয়েছিল!

সে ঠিক কথা।

থানায় কেউ তোমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছিল?

না, সাহেব। শুধু একটা সেপাই মাঝে-মাঝে, কিন্তু বড় দারোগা মাটির মানুষ, আমাকে বহিনজি, বহিনজি বলে ডাকছিল।

তা হলে সব পুলিশই খারাপ নয়। তুমি যেখানে ছিলে, সেটা দিল্লি। সেখানে বাঙালি মেয়েদের বেশ চাহিদা আছে। দিল্লি পুলিশ কিছুদিন তোমাকে হাজতে রাখে। তারপর সব খোঁজখবর নিয়ে এখানে পাঠিয়ে দেয়। আর তোমার ভয় নেই।

আমি বাড়ি ফিরে যাব না?

বাড়ি, হ্যাঁ, আগে আরও খোঁজখবর নিতে হবে। একটা মুশকিল হয়েছে কী জানো, রিপোর্টের এক জায়গায় লেখা আছে, লক্ষ্মীমণি পাড়ুই বেঁচে নেই, খবরের কাগজে দিল্লির ওই ঘটনা বেরিয়েছিল, তাতেই ছিল যে লক্ষ্মীমণি পাড়ুই নামে একজনের পেটেও গুলি লাগে। মুন্সিগঞ্জের সরিফন বিবির নাম নিরুদ্দেশ লিস্টে আছে। তুমি সরিফন বিবি হলে ঝঞ্ঝাট ছিল জনা। তুমি কি সত্যিই লক্ষ্মীমণি পাড়ুই?

আমি বেঁচে নাই। সাহেব, এই যে আমি আপনার সামনে বসে আছি, আমি বেঁচে নাই? হি হি হি হি। আমি মরে গেছি! তা ভালোই তো। আমার আর বেঁচে থাকার কী দরকার!

মরণেই সব জ্বালা জুড়োয়। মরলে আমি পেত্নি হব নিশ্চয়ই। হি হি হি হি। পেত্নি হলে এবার সবকটার গলা টিপে মারব। সব কটার।

১. ৪

এরপর সাতদিন কেটে গেছে। আয়রন সাইড রোডে সরকারি বাসভবনের তিনতলায় ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের ডি সি হুমায়ুন কবির-এর কোয়ার্টার। তার স্ত্রী-পুত্র-কন্যা গেছে মুর্শিদাবাদে দেশের বাড়িতে। গরম পড়েছে খুব, কবির সাহেব একটা পাজামা ও পাতলা সাদা পাঞ্জাবি পরে বসেছেন। বারান্দায় একটা ইজিচেয়ারে। তাঁর স্ত্রীর খুব ফুলের শখ, অনেকগুলি টবে ফুটেছে ফুল। বেল ফুল থেকে ছড়াচ্ছে সুগন্ধ।

খানিক বাদে এলেন তার বন্ধু বিনায়ক ঘোষাল। তিনি বেশ নামকরা লেখক, একটা সংবাদপত্রের সঙ্গেও যুক্ত। আজ তার একটা বক্তৃতা ছিল বিড়লা সভাঘরে, খুব কাছেই, সেখান থেকে টুক করে চলে এসেছেন বন্ধুর বাড়িতে।

বিনায়ক প্রথমে কয়েকটা ফুলগাছে আলতো করে হাত বুলোতে লাগলেন। ফুল ছেঁড়েন না তিনি, শুধু হাত বুলোন।

বিনায়কের ধারণা, গাছের গায়ে আদর করে হাত বুলোলে গাছ খুব খুশি হয়। গাছ এই ধরনের মানুষদের ভালোবাসে। এইভাবে মানুষ ও গাছের মধ্যে একটা অদৃশ্য যোগাযোগ হবে। হুমায়ুনের ধারণা গাছকে আদর করা ভালো। কিন্তু সন্ধের পর নয়। এই সময় গাছ ঘুমোয়। মানুষের চেয়েও ওরা অনেক আগে-আগে ঘুমোয়। সূর্যের আলোর সঙ্গেই তো ওদের সম্পর্ক।

হুমায়ুন বললেন, যথেষ্ট হয়েছে। এবার বসো। কিছু খাবে?

হুমায়ুন বললেন, স্টকে নেই বোধহয়। আনাতে হবে। মাসের শেষ ভাই, আমার হাতে বিশেষ কিছু নেই। তুমি দু-একখানা পাত্তি ছাড়ো!

পুলিশের আবার মাসের শেষ কী? এমন গরিব পুলিশ অফিসার আমি আগে দেখিনি। বন্ধুকে বিয়ার খাওয়াতেও পারো না, টাকা চাইছ! হাত পেতে ঘুষের টাকা নাই বা নিলে, ভেট নিতে পারো না? তাতে দোষ নেই।

কেউ তো দেয় না কিছু। বাঙালিরা বহুত কঞ্জুষ হয়ে গেছে। ঘুষ দিতে চাইলে নিতাম। কি না ভেবে দেখতাম। কিন্তু কেউ তো কিছু অফারই করে না।

তোমাদের সার্ভিসে মানস মজুমদার তোমার জুনিয়ার না? সে সল্টলেকে বাড়ি বানাচ্ছে। কী করে?

বলে তো যে ওর বউয়ের অনেক সম্পত্তি আছে। আমি শালা বিয়েও করেছি গরিবের মেয়েকে।

একটু পরে এল বিয়ারের বোতল।

প্রথম চুমুক দেওয়ার পর হুমায়ুন বললেন, তোমার সঙ্গে কাজের কথা আছে। সেদিন তুমি তো বসে-বসে অতক্ষণ ধরে শুনলে লক্ষ্মীমণি নামে মেয়েটির কথা। এবার তোমার ওপিনিয়ান জানতে চাই।

বিনায়ক বললেন, হ্যাঁ, শুনলাম। এমন তো নতুন কিছু নয়। এরকম কাহিনিই তো শোনা যায়।

তা ঠিক। এই ধরনের মেয়েদের কাহিনি অনেকটাই একরকম।

সেদিন আমি নিজে থেকে কোনও প্রশ্ন করিনি। করা উচিত ছিল না। কিন্তু মনের মধ্যে যেন কয়েকটা প্রশ্ন ঘোরাফেরা করছিল। মেয়েটি মাঝে-মাঝেই সত্যি কথা গোপন করছিল কেন?

ইচ্ছে করে? না, পুরোপুরি হান্ডেড পারসেন্ট সত্যি কথা অনেক মানুষই বলতে পারে না। অনেক মহাপুরুষও পারেন না। তুমি একই ঘটনা তিনবার বলতে বলো, দেখবে একটু একটু বদলে যাচ্ছে। টুথ ইজ আ ডিফিকাল্ট সাবজেক্ট। মিথ্যে কথা বলা সহজ। অনেক মানুষকে দেখেছি, এমনি-এমনি মিথ্যে কথা বলে, অকারণেও।

পুলিশের চাকরি করতে গিয়ে তোমার মানুষের চরিত্র বেশ ভালোভাবে স্টাডি করা হয়ে গিয়েছে, তাই না?

বিনায়ক, সামারসেট মম-এর কথাটা তুমি পড়োনি? মম এক জায়গায় বলেছেন, মানুষের চরিত্র সবচেয়ে ভালো বোঝে ইস্কুল মাস্টার, ডিটেকটিভ আর লেখকরা। সেই হিসেবে তুমি আর আমি একই লেভেলে, যদিও আমি লিখতে পারি না।

রিটায়ার করার পর স্মৃতিকথা লিখবে, খুব ইন্টারেস্টিং হবে। শোনো, মিথ্যে কথা ছাড়াও সেদিনের ইন্টারোগেশানে কয়েক জায়গায় ফঁক রয়ে গেছে। বলব?

বলো।

প্রথমত ধরো, লক্ষ্মী নামের বউটি চড়কের মেলায় যেতে চাইল, তাও অনেক দূরে, ট্রেনে যেতে হবে। তবু তার স্বামী পারমিশান দিয়ে দিল? আবার পাঁচটা টাকাও দিল। এটা কি স্বাভাবিক? গ্রামের বউরা এতটা স্বাধীনতা পায়?

সাধারণত পায় না। তবে, কোনও-কোনও স্বামী তো উদার হতেও পারে। বউকে যদি খুব ভালোবাসে, তার একটা শখ মেটাতেও পারে।

দ্যাখো, হুমায়ুন, ভালোবাসা শব্দটা অমন চট করে ব্যবহার কোরো না। বিভিন্ন জাতের মধ্যে, বিভিন্ন সামাজিক স্তরে ভালোবাসার রূপ নানারকম। আমরা যেভাবে ভালোবাসা বুঝি, গ্রামের নীচের তলার মানুষ কি সেভাবে বোঝে? গ্রামের মানুষ ভালোবাসতে জানে

না তা বলছি, কিন্তু তার ধরন-ধারণ আলাদা। সেই ভালোবাসার মধ্যে বোধহয় স্বাধীনতা বিশেষ থাকে না।

আমি বলছি না যে এরকমভাবে পারমিশান দেওয়া খুব স্বাভাবিক। কিন্তু কেউ কেউ ব্যতিক্রম হতেও পারে। কিংবা হয়তো লক্ষ্মী মিথ্যে বলছে, পারমিশান না নিয়েই বেরিয়ে গিয়েছিল।

আরও একটা ব্যাপার লক্ষ করো। শাশুড়ি কী বলেছে? হ্যাঁ কিংবা না কিছুই বলেনি। মুখের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল। সে মাঝে-মাঝে কাঁদত। তার মানে কী?

কিছু একটা মানে আছে নিশ্চয়ই।

আমার যতদূর ধারণা, শাশুড়ি হয়তো আগে থেকেই জানত, এ বউ আর ফিরবে না।

তার মানে তাড়িয়ে দিয়েছে।

তাড়িয়ে দিলে আর কাঁদবে কেন?

মানুষ বড় বিচিত্র প্রাণী। দ্যাখো, কোনও নর্মাল ফ্যামিলিতে বাড়ির বউ যদি মেলা দেখতে গিয়ে ফিরে না আসে, তা হলে হুলুস্থুল পড়ে যায়। চতুর্দিকে খোঁজখবর, আজকাল সবাই থানায় ডায়েরি করতেও শিখে গেছে। মুন্সিগঞ্জ থানায় কি লক্ষ্মীমণির নামে কোনও মিসিং ডায়েরি আছে?

মুন্সিগঞ্জে থানা নেই। থানা আছে পাশের গ্রাম নবীপুরে। সেখানে গত এক-দেড় বছরের মধ্যে লক্ষ্মীমণির কোনও উল্লেখ নেই। বরং সরিফন বিবি নামে একজনের নামে মিসিং ডায়েরি আছে।

তুমি এই সরিফন আর লক্ষ্মীমণির ব্যাপারটা গুলিয়ে ফেলেছ। আমরা যাকে দেখছি, সে লক্ষ্মীমণিই নিশ্চিতই। একেবারে সম্পূর্ণ পরিচয়টা বদলে ফেলার ক্ষমতা ওর নেই। বদলাবেই বা কেন?

বিনায়ক, তুমি আর একটা সম্ভাবনার কথা ভেবে দেখেছ? এ মেয়েটির স্বামী ও শাশুড়ির ব্যবহার খানিকটা স্ট্রেঞ্জ, তার একটা কারণ হতে পারে, ওকে হয়তো বিক্রি করে দেওয়া হয়েছিল।

সে কথাটা আমারও মনে এসেছে।

সব মেয়েকেই তো দালাল কিংবা আড়কাঠিরা ভুলিয়ে-ভালিয়ে পাচার করে না, অনেক মেয়ে বিক্রিও হয়। মেয়ে বিক্রির একটা নিঃশব্দ বাজার চলেছেই। তবে, সাধারণত পনেরো থেকে কুড়ি-বাইশ বছরের মেয়েরাই বিক্রি হয়, এর বয়েস পঁয়তিরিশ-ছত্রিশ, তবে এর স্বাস্থ্য ভালো, সেক্স অবজেক্ট হিসেবে দাম আছে।

বিক্রি করবে কেন? ঘরের বউ, দুটি সন্তান আছে তবু তাকে বিক্রি করবে, এতটা চরম দারিদ্র্য কি আছে? বাঁকুড়া-পুরুলিয়ায় আদিবাসীদের মধ্যে কিছুটা আছে, কিন্তু চব্বিশ পরগনার। গ্রামে, সে গ্রামে ভালো করে খোঁজখবর নিয়েছ?

তোমার একটা সিগারেট দাও, আমার শেষ হয়ে গেছে। হা, খোঁজ নেওয়া হয়েছে। তোমাকে একটু কু দিতে পারি। ওখানকার স্কুলে খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে, ক্লাস সিক্সে রতন পাড়ুই নামে একটি ছাত্র আছে, যার বাবার নাম ধীরাজ পাড়ুই। ছেলেটির মা নেই। খুব সম্ভবত এটাই সেই ফ্যামিলি।

ধীরাজের কোনও ভাই আছে?

না নেই। মানে এখন নেই, ছিল, মারা গেছে ছমাস আগে। এরা একেবারে না খেতে পাওয়ার মতন গরিব নয়। বছরের কয়েকটা মাস খুব টানাটানি চলে।

লক্ষ্মীই সেই কথা বলেছে। ধীরাজের যে ভাই মারা গেছে, তার নাম কী?

বিরাজ।

তবে তো মিলেই গেছে। আগে বলছিলে না কেন?

বিনায়ক, তোমাকে আগে বলিনি, তার কারণ আছে।

ওই বিরাজ কীসে মারা গেছে?

ক্যান্সারে।

সর্বনাশ। তার মানে তো প্রচুর খরচের ব্যাপার। চিকিৎসা করিয়েছিল কিছু?

হ্যাঁ। বিরাজ সার্ভে অফিসে কাজ করত, নির্দিষ্ট উপার্জন ছিল তার। তাকে বাঁচাবার জন্য তার মা ও দাদা সব চেষ্টা তো করবেই। চিকিৎসার খরচের জন্যই সম্ভবত বউটিকে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছিল। গ্রামের মানুষ ভাবে, বউ মরলে কিংবা বউ চলে গেলে আবার বউ পাওয়া যাবে। কিন্তু ভাই মরলে কিংবা ছেলে মরলে তো আর পাওয়া যাবে না। তাই বউদের জীবনের দাম কম।

জীবনের দাম কম, শরীরের কিছুটা দাম আছে।

এই বউটি বিক্রি হয়েই হোক কিংবা আড়কাঠির পাল্লায় পড়েই হোক, প্রায় এক বছর ধরে নানারকম অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে গেছে। এর থেকেও খারাপ অবস্থায় পড়ে অনেক মেয়ে। পুরোপুরি বেশ্যাবৃত্তিই করতে হয়। একে দেখা যাচ্ছে, একটা পর্যায়ে বেশ ভালো অবস্থাতেই ছিল।

সূরয সিং- এর সঙ্গে ইটভাটায়?

ওর কথা শুনে মনে হল যে নিজের স্বামীর চেয়েও পুরুষ হিসাবে সূরয সিং-কে বেশি পছন্দ হয়েছিল। তাই না? সূরয সিং যদি ওইভাবে মারা না যেত, তা হলে ওখান থেকে লক্ষ্মী আর পালাতে চাইত না!

অনেক মেয়েই তো আর ফেরে না।

বিনায়ক, তোমার কাছে একটা ব্যাপারে সাহায্য চাইছি। তুমি একজন গল্পলেখক, তুমি যদি লক্ষ্মীকে নিয়ে একটা গল্প লিখতে, তা হলে সে গল্পের শেষ পরিণতি কী হত?

ওকে বাড়ি ফিরিয়ে দিতাম।

কল্পনায়, না বাস্তবে? বাস্তবে কি ফিরিয়ে দেওয়া সম্ভব?

চেষ্টা করে দেখতে হবে।

তা তো আমরা চেষ্টা করবই। কিন্তু তুমি গল্প লিখলে কী হত? বিবাহিত মেয়েটি এই কমাসে বেশ কিছু পুরুষের সঙ্গে শুয়েছে, এমনকী একবার প্রেগন্যান্টও হয়েছিল, এসব তো আর লুকোবার উপায় নেই। এখন সে ফিরে এলেও তার শ্বশুরবাড়ি তাকে গ্রহণ করবে কেন? বরং সঙ্গে সঙ্গে তাড়িয়ে দেবে। শুধু আমাদের দেশে কেন, সব দেশেই এরকম হয়। গল্পে তুমি যদি মিলিয়ে দাও, স্বামী-স্ত্রী আবার এক সংসারে থাকতে লাগল, তা হলে বেশ একটা ইচ্ছাপূরণ হতে পারে। হ্যাপি এনডিং, অ্যান্ড দে লিভড হ্যাপিলি এভার আফটার। কিন্তু সেটা একেবারেই অবাস্তব।

ওরকম মিষ্টি মিষ্টি অবাস্তব গল্প আমি লিখি না।

মেয়েটাকে তা হলে তুমি কোথায় পাঠাবে?

এক কাজ করা যায়, ধরে নিচ্ছি স্বামী আর শাশুড়ি মিলে বউটাকে বিক্রি করেই দিয়েছিল। সেটা একটা গুরুতর অপরাধ। তোমরা দুজনে এ ব্যাপারে কনফার্মড় হয়ে দুজনকে জেলে দেওয়ার ভয় দেখাও। তখন বউটাকে ফেরত নিতে বাধ্য হবে।

আ-হা-হা, কী সলিউশানই বাতলালে! মাই ডিয়ার ফ্রেন্ড, পুলিশ ভয় দেখিয়ে বাধ্য করতে পারে, কিন্তু তাতে সম্পর্ক জোড়া লাগে না। কদিন বাদেই মেয়েটার ওপর দারুণ অত্যাচার শুরু করবে। পাড়া প্রতিবেশীরা ঘেন্নায় ওর সঙ্গে কথা বলবে না। ওকে তাড়াতে বাধ্য করবে। এরকম কেস আমরা আগেও দেখেছি।

তা হলে কী গতি হয় এইসব মেয়েদের?

ওর সামনে দুটোই পথ খোলা আছে। আত্মহত্যা কিংবা কোনও বেশ্যাপল্লিতে গিয়ে যোগ দেওয়া।

কেন, কোনও অনাথ আশ্রম-টাশ্রমে জায়গা পেতে পারে না?

এরকম কেস এত বেশি যে এদের আশ্রয় দেওয়ার মতন তত বেশি অনাথ আশ্রম আমাদের দেশে নেই। যেগুলো আছে, সেগুলোর পরিবেশও ভালো নয়। অনেক মেয়েই বেশিদিন টিকতে পারে না। আর যদি কোনও মেয়ের স্বাস্থ্যের জেল্লা থাকে, তা হলে সে কোনও না কোনও মাংস-ব্যবসায়ীর নজরে পড়বেই।

মেয়েটাকে যদি কোনও কাজ দেওয়া যায়, স্বাধীনভাবে উপার্জন করে একলা থাকতে পারে।

একটা অশিক্ষিত, গ্রাম্য মেয়ে। তাকে কী কাজ দেবে? বড়জোর ঝি-গিরি। তাও আগেকার পরিচয় জানতে পারলে কেউ ওরকম ঝিকে বাড়িতে রাখে না। তোমার বাড়িতে রাখবে? তোমার বউ রাজি হবে না! ওহে লেখকপ্রবর, বলো, বলো, এই মেয়েটার ভাগ্যে কী হবে।

আমি কী করে বলব!

সেইজন্যই তো জিগ্যেস করছি, তুমি এরকম একটা মেয়েকে নিয়ে গল্প লিখলে কোথায় শেষ করতে?

শোনো হুমায়ুন, অন্যের দেওয়া সাবজেক্ট নিয়ে আমি গল্প লিখি না। আর গল্প লেখার সময় তার নিজস্ব একটা গতি আসে। তাই আগে থেকে শেষটা বলা যায় না। আমি লেখক ছাড়াও তো একজন মানুষ। গল্পের চরিত্র হিসেবে নয়, আমি একজন অসহায় মেয়ে হিসেবেই ওর সম্পর্কে চিন্তিত। গল্প না লিখেও তো আমি ওকে কিছুটা সাহায্য করতে পারি। আশা করি পারব।

কী সাহায্য করবে?

এক্ষুনি বলতে পারছি না। একটা উপায় মাথায় এসেছে।

দুদিন বাদে লেখক আবার দেখা করলেন তাঁর পুলিশ বন্ধুটির সঙ্গে। লক্ষ্মীর জন্য একটা কাজ ঠিক হয়েছে।

লেখকের স্ত্রী বিশাখা একটা বাচ্চাদের স্কুলে পড়ান। তিনিই হেড মিস্ট্রেস। সেন্ট মেরি কিন্ডারগার্টেন স্কুল। বাচ্চাদের দেখাশুনা করার জন্য আয়া শ্রেণির দু-একটি মেয়েকে রাখতে হয়। সেই কাজ দেওয়া হল লক্ষ্মীকে।

প্রথম একমাস তার বাড়ির সঙ্গে যোগাযোগই করা হল না। দেখতে হল, লক্ষ্মী এ কাজ ঠিক পারছে কি না। লক্ষ্মী এ কাজ বেশ ভালোই পারছে। মন দিয়ে কাজ করে। স্কুলের পেছনে তার থাকার জন্য একটা ঘরও আছে। এক মাসের মাইনে অগ্রিম দেওয়া হয়েছে, সে নিজেই রান্না করে খায়। .

তারপর কী হল?

এবার পুলিশ খোঁজখবর নিল তার বাড়ির। ছেলেমেয়ে দুটিকে নিয়ে এল লক্ষ্মীর কাছে, তাদের জড়িয়ে ধরে মায়ের কী হাপুস কান্না!

ছমাস কেটে গেছে। দিব্যি ভালোই আছে লক্ষ্মী। একটা সুস্থ জীবন যাপন করছে। ছেলেমেয়ে দুটি মাঝে-মাঝেই আসে। একবার ওদের বাবাও সঙ্গে এল। সে-ও কাঁদল লক্ষ্মীর হাত ধরে।

স্বামীকে লক্ষ্মী পঞ্চাশটা টাকা দিল আর শাশুড়ির জন্য একটা শাড়ি। সেসব নিতে দ্বিধা করল না ধীরাজ।

এর পরেও লক্ষ্মীর জীবনে অন্য কিছু ঘটতে পারে। আপাতত সে একজন স্বাধীন মানুষের মতন বেঁচে আছে।

দ্বিতীয় পর্ব

২. ১

ভবানী ভবনের অফিস থেকে বেরিয়ে গাড়িতে উঠতে যাচ্ছেন কবির সাহেব, একজন আর্দালি ছুটতে ছুটতে এসে বলল, স্যার, আপনার একটা ফোন আছে।

বিরক্তিতে ভুরু কোঁচকালেন কবির সাহেব। এখন সোয়া ছটা বাজে। এই সময় ফোন এলেই বা তাকে ডাকতে হবে কেন? ছুটির পর বাড়ি যেতেও পারবেন না?

আর্দালিকে বকুনি দিলেন না কবির, তিনি জানেন, ইদ্রিশ নির্বোধ নয়, খুব জরুরি ফোন। না এলে সে এমন ভাবে ডাকতে আসবে না।

তিনি জিগ্যেস করলেন, কার ফোন?

ইদ্রিশ বলল, আই জি ক্রাইম স্যার। বর্ধন সাহেব স্যার।

এ পি বর্ধন কবিরের ওপরওয়ালা। তিনি যখনতখন ফোনে ডাকতেই পারেন। কিন্তু মোবাইলে কল না করে অফিসের ফোনে এই অবেলায় কেন?

বর্ধন ডাকলে আবার তিনতলায় উঠে ধরতেই হবে। উনি এতক্ষণ লাইন ধরে থাকবেন? এ পি বর্ধন কাজপাগল মানুষ। স্ত্রীবিয়োগ হয়েছে পাঁচ বছর আগে। ছেলে আর মেয়ে দুজনেই থাকে বিদেশে। তাই এখন আর সংসার বলে কিছু নেই, অফিসেই কাটান বারো-চোদ্দো ঘণ্টা।

কিন্তু কবির সাহেবের তো তা নয়। তার স্ত্রী ও ছেলেমেয়ে আছে। কবিরের গ্রামের বাড়ি মুর্শিদাবাদে। পৈত্রিক সম্পত্তি ও জমিজমা আছে। কাজের চাপে কবির সেখানে যাওয়ার

সময়ই পান না। স্ত্রী নীলোফারই ঘুরে আসে মাসে অন্তত একবার। গত সপ্তাহেই গেছে নীলোফার, আজই বিকেলে ফেরার কথা। আজ সন্ধেবেলা অন্য কোনও অ্যাপয়েন্টমেন্ট রাখেননি, নিরিবিলিতে ছেলেমেয়েদের সঙ্গে কাটাবেন ঠিক করেছিলেন।

তিনতলায় এসে দেখলেন, তার টেবিলের ওপর ল্যান্ড ফোনের রিসিভারটা পড়ে আছে। কিন্তু লাইন কেটে গেছে। সেটাই স্বাভাবিক। বর্ধন সাহেব কি এতক্ষণ ফোন ধরে থাকবেন নাকি?

কন্ট্রোল রুমকে তিনি বললেন, আবার যোগাযোগ করতে।

ফোন বাজার পরই কবির কিছু বলার আগেই বর্ধন বললেন, কবির?

দু-পায়ের গোড়ালি ঠোকাঠুকি করে স্যালুট দেওয়ার ভঙ্গিতে কবির বললেন, স্যার!

বর্ধন বললেন, শোনো কবির, আমার মোবাইল ফোনটা চুরি গেছে!

কবির কয়েক মুহূর্তের জন্য বিস্ময়ে বিহ্বল হয়ে গেলেন। এইজন্য তাঁকে অফিসের বাইরে থেকে ডেকে আনা হল? এত তুচ্ছ কারণে?

বর্ধন আবার বলতে লাগলেন, দুপুরের পর থেকে আর সেটাকে পাচ্ছি না। আজকাল চোর-ডাকাতদের কত সাহস বেড়েছে বলো তো? পুলিশের জিনিস চুরি করে। ওই ফোনে আমার কত ফোন নাম্বার, কত জরুরি বিষয় লোড করা আছে, হারিয়ে ফেললে চলবে না। সেটা খুঁজে বার করতেই হবে।

এপাশে কবিরের বিস্ময় কাটছে না। বর্ধনের মোবাইল খুঁজে বার করার দায়িত্ব তাঁকে নিতে হবে নাকি? এ তো অদ্ভুত কথা!

কবির আমতা-আমতা করে বললেন, কোথায়, কখন চুরি হল স্যার?

তা কে জানে! জানলে তো এতক্ষণ চোর ধরেই ফেলতাম।

স্যার, একটা কাজ করা যায়। কোম্পানিকে বলে সিমকার্ড যদি অচল করে দেওয়া যায়।

ওসব কি আমি জানি না ভাবছ? সবই করা হচ্ছে।

তা হলে আমাকে কী করতে হবে, স্যার?

কিচ্ছু না। ও হ্যাঁ, কাজ আছে তো বটেই। তুমি অফিসে আর কতক্ষণ আছ?

আমি তো কাজ শেষ করে বেরিয়ে পড়ছিলাম। তবে আপনি যদি থাকতে বলেন, আরও থাকব।

হ্যাঁ, বসে থাকো। ফাইলপত্তর দেখো। কাজের কি আর শেষ আছে? তোমার কাছে। একজনকে পাঠাচ্ছি একটু বাদে।

কে?

কে গেলেই বুঝতে পারবে। কবির, তোমার নামে গুরুতর অভিযোগ আছে।

স্যার! আমার নামে?

ইয়েস। তুমি একজন আসামিকে কোনও শাস্তি না দিয়ে ছেড়ে দিয়েছ? চার্জশিট দাওনি।

কোন আসামি স্যার? কবে?

নাম-টাম আমি জানি না। কবে-টবে তাও আমার মনে নেই। যে তোমার কাছে যাবে, সেই সব বলবে।

এরপরেই খলখল করে হেসে উঠলেন বর্ধন।

হাসতে হাসতে বললেন, কেমন সাসপেন্সে রাখলাম বলো? যে যাচ্ছে, তার নাম বলিনি। কোন আসামিকে ছেড়ে দিয়েছ, সে নামও জানালাম না। কিন্তু অভিযোগটা সত্যি। এখন বসে বসে আকাশ পাতাল ভাবো।

বর্ধনের এই স্বভাবটা জানেন কবির। অনেক সময়ই পুরো ব্যাপারটা খুলে বলেন না, হেঁয়ালি করতে ভালোবাসেন। এমনিতে বুড়ো বেশ পছন্দই করেন কবিরকে।

বর্ধন আবার বললেন, বউমা, ছেলেমেয়েরা সব ভালো আছে তো?

জি, স্যার। নীলু ছেলেমেয়েদের নিয়ে বহরমপুরে গিয়েছিল। আজ সন্ধেবেলাই ফেরার কথা।

আজ সন্ধ্যাবেলা ফিরবে? তারপর কি বউ-বাচ্চাদের নিয়ে বাইরের কোনও রেস্তোরাঁয় খেতে যাওয়ার প্ল্যান করেছিলে নাকি?

না, মানে, ঠিক সেরকম কোনও প্ল্যান করিনি, তবে...

সে গুড়ে বালি। আজ আর তোমার কোথাও যাওয়া হবে না। বউমাকে খবর দিয়ে দাও। নীলোফার যদি রাগারাগি করে, বলবে, পুলিশের কাজে কি সময়ের কোনও ঠিক-ঠিকানা থাকে নাকি? চব্বিশ ঘণ্টার ডিউটি। আমার নামে একটা গালাগালি দিও, খুব খারাপ কিছু দিও না, হারামজাদা-টারামজাদা বলতে পারো। বলবে, হারামজাদা বর্ধনটা তোমাকে ফাঁসিয়ে দিয়েছে, তার জন্যই তাড়াতাড়ি ফিরতে পারছ না।

স্যার, আপনার নামে এইরকম কিছু বললেই নীলু বেশি রাগ করবে। সে ভাববে, আমি বানিয়ে বলছি।

ঠিক আছে, গুড লাক। কাল সকালে আমায় খবর দিও।

ফোন ছেড়ে দেওয়ার পর কবিরের ভুরুটা কুঁচকে রইল। কোনও আসামিকে ছেড়ে দিয়েছে? কে? এরকম অভিযোগ তাঁর নামে কেউ কখনও দেয়নি। এখন কতক্ষণ বসে থাকতে হবে, কে জানে।

বাড়িতে এক্ষুনি ফোন করার দরকার নেই। আগে দেখা যাক, কে আসে, সে কী বলে।

কবির অফিসে বসে থাকলে তার আর্দালি ইদ্রিশ আর পি এ সুবিমলেরও ছুটি নেই। এটাই রীতি।

ইদ্রিশকে ডেকে তিনি এক কাপ চা আনালেন। ফাইল তো জমে থাকেই সব সময়। এখন আর ফাইল দেখতে ইচ্ছে করছে না।

সুবিমল নোট বুক আর কলম নিয়ে এসে দাঁড়াল।

কবির বললেন, তোমাকে ডাকিনি তো?

সুবিমল বলল, আপনি বেরিয়েও ফিরে এলেন স্যার। তাই ভাবলাম, জরুরি কোনও কাজ আছে।

কবির বললেন, নাঃ! একজন দেখা করতে আসবে।

আপনার কোনও বন্ধু?

না, না। বর্ধন সাহেব পাঠাচ্ছেন। ইম্পর্টান্ট কেউ হবেন নিশ্চয়ই। তুমি ইচ্ছে করলে বাড়ি যেতে পারো।

না স্যার, আমি থাকছি।

চা খাওয়ার পর একটা সিগারেট টানার জন্য মনটা উসখুস করে। অফিস ঘরের মধ্যে সিগারেট খাওয়া নিষিদ্ধ হয়ে গেছে। পাশের একটা ছোট ছাদে গিয়ে খাওয়া যায়। ছুটি হয়ে গেছে, এখন নিয়ম না মানলেও চলে। কবির ঘরে বসেই একটা সিগারেট ধরালেন।

সুবিমল এখনও দাঁড়িয়ে, সে বলল, স্যার, ডাক্তারের মার্ডার কেসটা–

কবির বললেন, ওসব কথা এখন থাক। তুমি এখনই যদি বাড়ি যেতে না চাও, তুমি তো গল্পের বই পড়তে ভালোবাসো, নিজের জায়গায় গিয়ে বই-টই পড়ো।

কবিরের মোবাইল ফোনটা বেজে উঠল। তাঁর বন্ধু বিনায়কের নম্বর।

তিনি বললেন, আজ সন্ধেবেলা তুমি বাড়িতে থাকছ? তা হলে একবার যেতে পারি।

কবির জানলার বাইরের দিকে তাকিয়ে বললেন, এখনই তো সন্ধে হয়ে গেছে। অফিসে বসে আছি। কখন ফিরতে পারব ঠিক নেই।

বিনায়ক বললেন, এখনও এত কাজ? পুলিশের চাকরিটা এবার ছাড়ো। সারা দিন, রাত পর্যন্ত শুধু চাকরিই করবে, তা হলে জীবনের অনেক কিছুই উপভোগ করা যাবে না।

চাকরি ছাড়লে খাব কী? ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া...

মাস ছয়েক দু-হাতে ঘুষ নাও! এত বড় পুলিশ অফিসার অথচ গরিব, এ আবার হয় নাকি?

তোমাকে তো বলেইছি, আমাকে কেউ ঘুষ দিতেই চায় না। ঘুষ অফার করলে নেব কি নেব না তা ঠিক করতাম, কিন্তু কেউ তো অফারই করে না।

তোমার যারা নীচের কর্মচারি, তারা নিশ্চয়ই প্রচুর ঘুষ নেয়। পুলিশ সম্পর্কে এটা সবাই জানে। তারা তোমাকে ভাগ দেয় না?

কেউ ভাগ দিতে চাইলে যদি আমি তাকে সাসপেন্ড করি, সেই ভয়ে, সবাই আমার কাছে সাধু সেজে থাকে।

তা হলে থাকো তোমার কাজ নিয়ে। আমি এক বাড়িতে গান-বাজনা শুনতে যাচ্ছি।

বিনায়ক ছেড়ে দেওয়া মাত্রই আবার সেই ফোন বাজল।

এবার আবার বর্ধন সাহেব।

কবির, যাকে পাঠিয়েছি, সে পৌঁছেছে?

না স্যার, এখনও কেউ আসেনি।

আসবে, দু-পাঁচ মিনিটের মধ্যেই এসে পড়বে।

আমি অপেক্ষা করব, স্যার।

শোনো, তোমায় এবার ফোন করছি মোবাইল ফোন থেকে। বুঝতে পেরেছ? তার মানে আমার মোবাইলটা পাওয়া গেছে।

আই অ্যাম গ্ল্যাড টু হিয়ার দ্যাট স্যার। থ্যাঙ্ক ইউ স্যার।

এতক্ষণে কবিরের ঠোঁটে হাসি ফুটে উঠল। চুরি না ছাই। একদিন অন্তর একদিন বর্ধন। সাহেব তার মোবাইল ফোন হারান, আবার খুঁজেও পাওয়া যায়। বউ মারা যাওয়ার পর উনি আরও বেশি ভুললামনা হয়ে গেছেন।

আরও দশ মিনিট পরে এল সেই আগন্তুক।

রহস্যময় কেউ না। দিল্লি পুলিশের ডিটেকটিভ বিভাগের এক ইনসপেক্টর, এঁর নাম দুর্লভ সিং। এঁর সঙ্গে আগেও একবার দেখা হয়েছে কবিরের।

পদাধিকারে দুর্লভ সিং ছোট, তাই সে প্রথামতন ঘরে ঢুকেই স্যালুট করল প্রথমে।

কবির ইংরেজিতে বললেন, আরে, কী ব্যাপার, দুর্লভ সিং, বসুন, বসুন।

প্রথমে একটুক্ষণ সাধারণ ভদ্রতার কথাবার্তা হয়। দিল্লির অন্যান্য পরিচিত অফিসাররা কে কেমন আছে। আজকাল সন্ত্রাসবাদীদের কার্যকলাপ নিয়েই পুলিশ বিভাগ ব্যতিব্যস্ত। দুর্লভ সিং কি সেই ব্যাপারে কোনও নতুন তথ্য এনেছে?

দুর্লভ সিং বলল, না, স্যার। আমি এসেছি একটা খুনের কেসের তদন্ত উপলক্ষে। খুনটা দিল্লিতে হয়েছে ছমাস আগে। দুজনকে গ্রেপ্তারও করা হয়েছিল, কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে কিছু প্রমাণ করা যায়নি। এমনকী, খুনটা যে সত্যি-সত্যি হয়েছিল, তারও কোনও প্রমাণ নেই।

কবির ভুরু তুলে বললেন, খুন হয়েছিল কি না তার কোনও প্রমাণ নেই, তা হলে আবার কীসের কেস?

দুর্লভ সিং বলল, ব্যাপারটা এইরকম। দুই বন্ধুতে মিলে দিল্লির রাজেন্দ্রনগর এলাকায় একটা বাড়িতে ঢুকেছিল এক সন্ধেবেলা। বাড়িটাতে নিয়মিত মধুচক্র বসত গোপনে। চারটি মেয়ে থাকত। সহদেব আচারিয়া আর শিউলাল ঝা নামে দুই বন্ধু যে সেই বাড়িতে ঢুকেছিল, তার সাক্ষী আছে। তারপর একটি মেয়ের ঘরে কিছু গোলমাল হয়। শিউলাল ঝা পালায় সেখান থেকে। দুদিন পরে সেই শিউলাল ঝা থানায় এসে অভিযোগ করে যে তার বন্ধুকে ওই বাড়িতে খুন করা হয়েছে। সে কথা শুনে পুলিশ সে বাড়ি রেইড করেছিল। কিন্তু সেখানে সহদেব আচারিয়ার ডেডবডি খুঁজে পাওয়া যায়নি। খুনোখুনির কোনও চিহ্নও বোঝা যায়নি। বরং একটি মেয়ে অভিযোগ করেছিল যে ওই দুই বন্ধু একটা ঝগড়া বাধিয়ে টাকাপয়সা না দিয়েই পালিয়েছিল। কিন্তু সহদেব আচারিয়া গেল কোথায়? আর কিছুই যদি না হয়ে থাকে, তা হলে শিউলাল নিজে থেকে থানায় গিয়ে অভিযোগ জানাল কেন? পুলিশ প্রচুর খোঁজ করেও সহদেব আচারিয়ার কোনও ট্রেস পায়নি। তার বাড়ি থেকেও বলা হয়েছিল যে, সহদেব মিসিং।

একটু বাধা দিয়ে কবির জিগ্যেস করলেন, ওই সহদেবের বয়েস কত?

দুর্লভ বলল, বত্রিশ। খুব বড় একটা ব্যবসায়ী বাড়ির ছেলে।

তা হলে সহদেবের বাড়ির লোক থানায় ডায়েরি করেনি কেন? একজন বত্রিশ বছরের লোক বাড়ি ফেরেনি।

সহদেবের বাবা বলেছেন, সহদেব আগেও মাঝে-মাঝেই দু-তিন দিন বাড়ির বাইরে রাত কাটাত, কোনও খবর দিত না। সেইজন্যই সেবারেও তারা ব্যস্ত হননি। সহদেব অন্য কোনও রাজ্যে গিয়ে ঘাপটি মেরে থাকতে পারে, বিদেশেও চলে যেতে পারে। টাকাপয়সার কোনও অভাব নেই।

দেন, হোয়াট?

ডেডবডি না পাওয়া গেলে মার্ডার যে কমিটেড হয়েছে, তা বোঝা যাবে কী করে? তাই কিছুদিন পর কেসটা চাপা পড়ে যায়।

এরকম অনেক কেসই তো চাপা পড়ে থাকে, আবার কোনও কোনও কেস কিছুদিন পরে মাথা তোলে। তাই তো হয়েছে?

ইয়েস স্যার। রাজেন্দ্রনগরের ওই যে বাড়িটা, পুলিশ সেখানকার মধুচক্র ভেঙে দেয়। মেয়েগুলো পালিয়ে যায়। বাড়িটা কিছুদিন খালি পড়ে ছিল, তারপর বিক্রি হয়ে যায়। এখন। ওই সব বাড়িই ভেঙে মালটি-স্টোরিড বিল্ডিং হয়। বাড়িটা বেশ সুন্দর, তিনতলা বাড়ি, সামনে একটু বাগান, গোটা তিনেক সার্ভেন্টস কোয়ার্টার। প্রোমোটার এসে পুরো বাড়িটারই সব ইট খসিয়ে ফেলে। সার্ভেন্টস কোয়ার্টারগুলো ভাঙতে গিয়ে দেখা গেল, একটা ঘরের মেঝেতে একটা ডেডবডি পোঁতা আছে। খুব বেশি পুরোনো নয়।

পুলিশের চাকরিতে এরকম ঘটনা আরও শুনেছেন কবির, তাই খুব বেশি চমকিত না হয়ে বললেন, হু, এটাই সেই লোকটা, কী যেন নাম বললে?

দুর্লভ বলল, পচাগলা অবস্থা, দেখে চেনার কোনও উপায় নেই। তবে, সেই ডেডবডির দাঁত পরীক্ষা করে নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া গেছে যে সেই লোকটিই সহদেব আচারিয়া। তার শরীরে কোনও পোশাক ছিল না, কিন্তু তার বাঁ হাতে একটা লোহার বালা ছিল, সেটা ওরা খুলতে পারেনি। ডেডবডির মাথায় ছিল বড়-বড় কাচের টুকরো, তাতেই বোঝা যায়, ওকে মারা হয়েছে মাথায় বোতল ভেঙে।

কেসটা আবার রি-ওপন করা হল?

জি স্যার। বড়লোকের বাড়ির ছেলের ব্যাপার, তারা এই নিয়ে হইচই করতে চায় না, খবরের কাগজকে জানাতে চায় না, তবে খুনির শাস্তি চায়। খুনের সময় ওই বাড়িতে যারা ছিল, তারা সব কে কোথায় গেছে, তার ঠিক নেই। খুঁজে পাওয়াই মুশকিল। পুলিশ তবু একটা সোর্স থেকে খবর পেয়ে একটি মেয়েকে স্পট করল। তার আগে যা-ই নাম থাক, এখন নাম গীতা চাওলা। তাকে দেখে খুব ভদ্র বাড়ির মেয়ে ছাড়া আর কিছুই মনে হবে না। স্মার্ট, সফিসটিকেটেড চেহারা ও ব্যবহার, ফরফর করে ইংরিজি বলে। এখন সে একটা লন্ড্রি শপ চালায় বসন্তবিহারে। থানায় এনে তাকে জেরা করতেই প্রথকেই সে অবাক করে দিল। সে স্বীকার করল যে, হা সে এক সময় বেশ্যাবৃত্তি করত, কারণ তার খুব টাকার দরকার ছিল, রাজেন্দ্রনগরের ওই বাড়িতেও সে ছিল কিছুদিন। হাতে বেশ কিছু টাকাপয়সা জমার পর সে স্বেচ্ছায় ওই পেশা ছেড়ে দিয়েছে।

রাজেন্দ্রনগরের ওই বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে দেড় বছর আগে। সহদেব আচারিয়া কিংবা শিউলালকে সে চেনে না, কোনওদিন দেখেনি। ওই খুনের ঘটনাও সে বিন্দুবিসর্গ জানে না। রাজেন্দ্রনগরের ওই বাড়ি যে সে আগেই ছেড়েছে, তার প্রমাণও দিল, বসন্তবিহারে এক ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়েছে দেড় বছর আগে, তখন থেকে সে ওই দোকান চালাচ্ছে। আপনি জানেন স্যার, এই সব মেয়েদের, এরা আগে থেকে সব আটঘাট বেঁধে রাখে। পুলিশকে ভয় পায় না, বেশ্যাবৃত্তি করেছে বলে লজ্জা-শরমের কোনও ব্যাপার নেই, অনেক জেরা করেও তাকে মচকানো গেল না।

এরা কিছুটা সত্যি আর কিছুটা মিথ্যে বলে, সেটাই বেশি বিপজ্জনক। মেয়েটি ওই বাড়িতে ছিল, তা স্বীকার করে নিল। কিন্তু খুনের সময় ছিল কিনা, তা প্রমাণ করা যাবে না।

স্যার, একটা শুধু হিন্ট ওর কাছে থেকে পাওয়া গেল। ওই বাড়ির একটা ম্যাপ দেখিয়ে ওকে জিগ্যেস করা হল, কোন ঘরে কে থাকত। যে সার্ভেন্ট কোয়ার্টারের মেঝের তলায় ডেডবডিটা পাওয়া গেছে, সেই ঘরে যে থাকত তার নাম কী? গীতা বলেছিল, তার সময়ে ওই ঘরে থাকত সরিফন বিবি নামে একজন মেড সারভেন্ট। ঘটনার সময়ও সেই সরিফন বিবি ছিল কিনা তা সে জানে না।

আচ্ছা, দুর্লভ সিং, তোমাকে একটা কথা জিগ্যেস করি। খুনের অভিযোগ শোনার পরই পুলিশ যখন ওই বাড়ি সার্চ করে, তখন সার্ভেন্টস কোয়ার্টারগুলো দেখেনি?

দেখেছিল স্যার। প্রত্যেকটা ঘর ভালো করে দেখেছিল।

মেঝেটা খুঁড়ে যদি একটা বডি পুঁতে দেয়, তারপর গর্ত বুঝিয়ে সিমেন্ট করে দিলেও তো কিছুটা কঁচা থাকবে, নতুন সিমেন্ট বলে বোঝা যাবে। তোমাদের তাতে সন্দেহ হয়নি?

সার্চ পার্টিতে আমি ছিলাম না স্যার। নিখিল মিশ্র একটা টিম নিয়ে গিয়েছিল। তাকে আমি জিগ্যেস করেছি। সে বলেছে, ওই ঘরে ঢোকার পর দেখেছিল, একজন মেড সারভেন্ট খাঁটিয়া পেতে শুয়ে জুরে কোঁকাচ্ছে। কেউ একজন বলেছিল, মেয়েটির চিকেন পক্স হয়েছে। তাই শুনে নিখিল আর সেখানে বেশিক্ষণ থাকেনি। এজন্য অবশ্য তাকে খুব একটা দোষ দেওয়া যায় না।

তার মানে ওই মেড সারভন্টটি অভিনয় করেছে। এরা পারেও বটে। ওয়েল?

কবির এবার একটা সিগারেট ধরালেন। চেয়ে রইলেন দুর্লভের চোখের দিকে। দুর্লভও চেয়ে রইল সোজাসুজি।

কবিরই আবার জিগ্যেস করলেন, যা শুনলাম, এ তো তোমাদের দিল্লির ব্যাপার। তুমি কলকাতায় আমার সঙ্গে দেখা করতে এলে, এর সঙ্গে আমি কী ভাবে জড়িত?

দুর্লভ বলল, আমি একটা এনকোয়ারির জন্য এসেছি। হয়তো আমার ভুলও হতে পারে। সে জন্য আমি আগে থেকেই ক্ষমা চেয়ে রাখছি। আমি অসময়ে এসে বিরক্ত করছি আপনাকে

না, না, ঠিক আছে। তুমি তোমার ডিউটি করছ। বলল, কী ব্যাপার?

ওই মেইড সারভেন্টটির নাম সরিফন বিবি। বাঙালি। আমাদের রেকর্ড বলছে। একটা মেয়ে পাচার চক্র দিল্লি পুলিশ ধরে ফেলে। সেই মেয়েদের মধ্যে বেশ কয়েকজন বাঙালিও ছিল। তাদের পাঠিয়ে দেওয়া হয় কলকাতায়। আপনি তাদের জবানবন্দি নিয়েছিলেন। তাদের মধ্যে ওই সরিফন বিবিও ছিল। আপনি স্যার তাকে কোর্টে প্রোডিউস করেননি। গভর্নমেন্টের কোনও পারমিশানও নেননি। তাকে বেকসুর ছেড়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু এখন ওই সরিফন বিবির হোয়ার অ্যাবাউটস আমাদের জানা দরকার।

কথায় কথায় অনেকটা সময় কেটে গেছে। প্রায় পৌনে নটা বাজে। নীলু এখনও ফোন করল না, বাড়ি পৌঁছেছে? ভেতরে-ভেতরে অস্থির বোধ করলেন কবির।

সরিফন বিবি? একগুচ্ছ উদ্ধার পাওয়া মেয়ের জবানবন্দি তিনি নিয়েছিলেন পাঁচ-ছমাস আগে। তাদের মধ্যে সরিফন বিবি বলে কেউ ছিল? মনে নেই। মনে রাখা সম্ভবও নয়।

হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠে কবির বললেন, তুমি কী বলতে চাও দুর্লভ সিং? একটি মেয়ের নামে মার্ডার চার্জ আছে, তবু তাকে আমি ছেড়ে দিয়েছি, কোনও রেকর্ড না রেখে, এটা তো আমার সার্ভিসের পক্ষে কলঙ্ক। ওকে আমি ছেড়ে দিয়েছি, সে মুসলমান বলে?

দুর্লভ প্রায় কেঁদে উঠে বলল, এ কী বলছেন স্যার? এরকম কথা আমার ঘুণাক্ষরেও মনে আসেনি। আপনি যখন তাকে ছেড়ে দেন, তখন তার নামে মার্ডার চার্জ ছিল না। কোনও

চার্জই ছিল না। আপনি তাকে ছেড়ে দিয়ে হয়তো ঠিকই করেছেন। আমি শুধু বলতে এসেছি, ওই সরিফন বিবিকে খুঁজে বার করা আমাদের পক্ষে খুবই দরকার। সে জন্য আপনার সাহায্য চাই।

হঠাৎ হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে ওঠা কবিরের একটা বাজে স্বভাব। এ জন্য তিনি নিজেই লজ্জা পেয়ে গেলেন এবার। তিনি বুঝতে পারলেন বর্ধন সাহেবের দুষ্টুমিটা। কবিরকে তিনি এইভাবে খেপাতেই চেয়েছিলেন।

নিজেকে সংযত করে কবির বললেন, অফকোর্স তোমাকে আমরা সব রকমভাবে সাহায্য করব। দাঁড়াও।

বেল টিপলেন কবির।

ইদ্রিশ এসে উঁকি মারতেই বললন, সুবিমলবাবুকে বোলাও।

সুবিমলও এসে গেল সঙ্গে-সঙ্গে।

কবির বললেন, সুবিমল, ইনি দুর্লভ সিং, দিল্লি থেকে এসেছেন। কিছু জরুরি কথা আছে। তুমি বোসো।

বড় অফিসারের সামনে সুবিমল কখনও বসে না। কবির প্রত্যেকবারই তাকে বসতে বলেন, তবু সে দাঁড়িয়ে থাকে।

কবির জিগ্যেস করলেন, সুবিমল, তোমার মনে আছে, কয়েকমাস আগে মেয়ে পাচারকারিদের হাত থেকে উদ্ধার করা কয়েকটি মেয়ের কেস হিস্ট্রি আমরা রেকর্ড করেছিলাম?

সুবিমল বলল, হ্যাঁ, মনে আছে স্যার।

ওদের মধ্যে সরিফন বিবি বলে কেউ ছিল? ফাইল দ্যাখো তো!

ফাইল দেখতে হবে না। আমার মনে আছে, ওই নামে কেউ ছিল না।

ছিল না?

না স্যার।

কবির এবার দুর্লভের দিকে ফিরে জ্বলন্ত চোখে বললেন, দেখলে? দেয়ার ওয়াজ নো সরিফন বিবি। তুমি ভুল ইনফরমেশান নিয়ে এসেছ। অ্যান্ড দেয়ার এনডস দ্যা ম্যাটার।

দুর্লভ কোনও কথা বলল না।

সুবিমল বলল, স্যার, আমি আর একটু বলতে পারি? সেইসময়, সরিফন বিবির নাম উঠেছিল কয়েকবার। লক্ষ্মীমণি পাড়ুই নামে আর একটি মেয়ের সঙ্গে তার নাম গুলিয়ে ফেলা হচ্ছিল কয়েকবার। লক্ষ্মীমণি আর সরিফন বিবি, এদের দুজনেরই বাড়ি পাশাপাশি গ্রামে। ইট ওয়াজ আ কোয়েশ্চেন অফ মিসটেকেন আইডেনটিটি। আমাদের রেকর্ডে স্পষ্ট করা আছে যে সরিফন বিবি আগেই মারা গেছে, তবু লক্ষ্মীমণিকেই কয়েকবার সরিফন বিবি বলা হয়েছে।

দুর্লভ হতাশভাবে বলল, সরিফন বিবি মারা গেছে? আর ইউ শিওর?

সুবিমল বলল, রেকর্ডে তাই রয়েছে।

দুর্লভ বলল, যাঃ! তা হলে তো আবার গভীর গাড্ডায় পড়া গেল! আর তো কোনও লিড রইল না।

সুবিমল বলল, স্যার, এই লক্ষ্মীমণির কেসটা খুব পিকিউলিয়ার। তার সঙ্গে কথা বলার সময় দু-একবার সরিফন বিবির নাম এসেছে, তখনই সে বলেছে যে, না, না, আমি সরিফন নই। যদিও তার বয়ানে শেষের দিকে দিল্লির রাজেন্দ্রনগরের ওই বাড়ির

খুনোখুনির উল্লেখ আছে। এমনও হতে পারে, ওই সময় লক্ষ্মীমণিকেই অনেকে মনে করত সরিফন, সে-ই থাকত ওই ঘরটায়।

অন্য দুজন একেবারে চুপ।

সুবিমল অন্যদিকে তাকাল।

সুবিমল কয়েক মুহূর্ত পরে কবিরের দিকে চেয়ে বলল, স্যার, আপনার মনে নেই, আপনার বন্ধু, ফেমাস রাইটার বিনায়কবাবুও তখন উপস্থিত ছিলেন। লক্ষ্মীমণির স্টেটমেন্ট আমি রেকর্ড করে রেখেছি।

কবিরের ইচ্ছে করল, সুবিমলের গালে ঠাস-ঠাস করে দুটো চড় মারতে। সুবিমল যা বলছে, তা মিথ্যে নয়। কিন্তু এই সব কথা দুর্লভের সামনে বলার কী দরকার ছিল?

কবিরের সব মনে পড়ে গেছে। লক্ষ্মীমণির মুখটাও তিনি দেখতে পাচ্ছেন। ওই সরল গ্রাম্য মুখে কি কোনও মিথ্যে কথা মানায়! আবার নিজের অভিজ্ঞতাতেও তিনি বুঝেছেন, অনেক মেয়েই বেশ ভালো অভিনয় করতে পারে। শহরের মেয়েদের তুলনায় গ্রামের মেয়েরাও কম যায় না।

দুর্লভ এবার বলল, স্যার, ওই লক্ষ্মীমণিকেও কি ট্রেস করা যাবে? তার সঙ্গে একটু কথা বলতে পারলে ভালো হত।

লক্ষ্মীমণি কোথায় আছে, তা কবির জানেন। সব নিয়ম কানুন না মেনেই তিনি একদিন লক্ষ্মীমণিকে পুলিশের হেফাজত থেকে বার করে দিয়েছিলেন। ভেবেছিলেন, এ নিয়ে কোনওদিন কোনও প্রশ্ন উঠবে না।

হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, দুর্লভ, আজ অনেক রাত হয়ে গেছে। এ নিয়ে কাল আবার কথা হবে। তুমি কাল সকালে আমার ফ্ল্যাটে চলে এসো–

২. ২

সকালে প্রথম ফোনটা এল বর্ধনের কাছ থেকে।

কবির তখন প্রথমবার চা পান করে দাড়ি কামাচ্ছে। এই সময় টিভি খোলা থাকে, সকালবেলা বেশ কয়েকটা চ্যানেলেই গানবাজনা হয়। তাঁর ছেলে মিঠুন তাকে কর্ডলেস ফোনটা এনে দিল।

বর্ধন খানিকটা হাসি মিশিয়ে জিগ্যেস করলেন, কী হে কবির সাহেব, ঘুম ভাঙালাম নাকি? কটার সময় বিছানা ছেড়ে ওঠো?

কবির বললেন, স্যার, আমি তো অনেকক্ষণ উঠেছি. রোজই এই সময় উঠি।

উহুঃ, তা ঠিক নয়। খুব দরকার পড়লে তুমি ভোর পাঁচটাতেও জেগে উঠে রেডি হতে পারো, তা জানি। আবার এক একদিন নাকি সকাল দশটা পর্যন্ত ঘুমোও? রোদ্দুর উঠে গেলে, পাখি-টাখি ডাকে, গাড়ি-ঘোড়ার পা-পোঁ শুরু হয়ে যায়, তার পরেও মানুষ কী করে ঘুমোতে পারে, তা আমি কিছুতেই বুঝি না!

স্যার, আমি বেলা দশটা পর্যন্ত কোনওদিনই ঘুমোই না। অফিস যেতে হয়।

গত মাসের সাত তারিখে তুমি সাড়ে দশটা পর্যন্ত ঘুমোওনি?

ও, সেদিন, মানে, আগের রাত্তিরে আমি হোল নাইট জেগে গান শুনেছিলাম, আপনি সেই সকালটার কথা মনে করে রেখেছেন?

শুধু গান শোনা, নাকি এক বোতল স্কচও শেষ করেছিল, অ্যাঁ? আমি সব খবর রাখি। কাল বউমার কাছে বকুনি খেয়েছ?

খুব বেশি নয়। আমায় তো প্রায়ই বলেন, পুলিশের চাকরি ছেড়ে দিতে!

চাকরি থেকে বরখাস্ত না হলে কোনও পুলিশই নিজে থেকে চাকরি ছাড়ে না। যাই হোক, তুমি আজ সকালে দুর্লভ সিং-কে তোমার বাড়িতে আসতে বলেছ?

জি, স্যার।

আমাকে কিছু বলেনি। আমি নিজেই নিজেকে ইনভাইট করছি। সেলফ ইনভাইটেড, আমিও একটু পরে আসছি তোমার বাড়িতে।

ইউ আর মোস্ট ওয়েলকাম, স্যার।

ব্রেকফাস্ট করিনি এখনও। খাওয়াবে নিশ্চয়ই। নীলোফার খুব চমৎকার চিজ-ওমলেট বানায়। একবার খেয়েছিলাম, মুখে এখনও স্বাদ লেগে আছে। বাড়িতে আমাকে ডিম খেতে দেয় না, বলে কিনা কোলেস্টেরল হাই। তাই অন্যের বাড়িতে গিয়ে খাই। আজও খাব, ডাবল ডিমের ওমলেট।

সাড়ে নটার একটু আগে, দুর্লভ সিং এখনও পৌঁছোয়নি, এসে গেলেন বর্ধন। ছেলেমেয়েদের জন্য একগাদা চকলেট এনেছেন, নীলোফারের জন্য এনেছেন একটা শান্তিনিকেতনী চামড়ার ব্যাগ। তিনি এদের পরিবারিক বন্ধু, কখনও খালি হাতে আসেন না।

পুলিশের নিয়ম অনুযায়ী কবির এঁকে কোনওরকম ব্যক্তিগত সম্বোধন করতে পারেন না, কিন্তু নীলোফার মানে না সেসব। বর্ধন সাহেব তার কাছে অতুলদা।

দরজা খুলেই নীলোফার বলল, এ কী, অতুলদা, আপনি এই একমাসেই অনেক রোগা হয়ে গেছেন?

বর্ধন করুণ মুখ করে বললেন, বাড়িতে যে কিছু খেতে দেয় না! বউটা আমাকে কেন যে রেখে কেটে পড়ল, ছেলেমেয়েরা কাছে থাকে না, বাড়িতে আছে এক হাউজ কিপার, অতি

জাঁদরেল, সব সময় বলে, মিষ্টি খাবে না, পাঁঠার মাংস খাবে না। সম্পর্কে সে আবার আমার দুরসম্পর্কের দিদি হয়, একটু ইংরিজি ফিংরিজিও জানে, তাই আমাকে বকুনি দেওয়ার তার অধিকার আছে। না খাইয়ে খাইয়েই আমাকে মেরে ফেলবে।

এ পি বর্ধন এমনিতেই বেশ লম্বা, এখন কিছুটা রোগা হয়ে আরও লম্বা দেখায়, অনেকটা ল্যাকপেকে ধরনের। তাকে দেখলে পুলিশ বলে মনেই হয় না।

নীলোফারের দিকে তাকিয়ে চক্ষে ঝিলিক দিয়ে তিনি বললেন, আজ সিরিয়াস আলোচনা হবে। তোমার স্বামীর চাকরি থাকে কিনা ঠিক নেই।

বলেই হাসতে লাগলেন। তাঁর কোন কথা সিরিয়াস আর কোনটা রসিকতা, তা বোঝা দায়।

নীলোফার বলল, চাকরি গেলেই বাঁচি। তাহলে আমরা বহরমপুরে গিয়ে থাকব।

কবিরের চেহারা সুগঠিত, সুন্দর। বয়েস সাতচল্লিশ। পুরো ধরাচুড়ো পরলে তাকে পুলিশের বড় অফিসার হিসেবে বেশ মানায়। বাড়িতে তিনি পাজামা ও সাদা পাঞ্জাবি পরতে ভালোবাসেন।

বসবার ঘরে এসে একটা সোফায় গা এলিয়ে দিয়ে বর্ধন বললেন, দুর্লভ এখনও আসেনি, তার আগে সরিফন বিবির কেসটা কী শুনি?

কবির বললেন, দিল্লির পুলিশ মেয়ে-পাচারকারিদের হাত থেকে উদ্ধার করে কয়েকটি মেয়েকে আমার কাছে পাঠিয়েছিল। ছ-সাত মাস আগে। মেয়েগুলির নামের যে লিস্ট ছিল, তার মধ্যে একটি নাম নিয়ে প্রথম থেকেই গোলমাল হয়। একটি নাম ছিল সরিফন বিবি। অথচ মেয়েগুলির কারুরই ওই নাম নয়। অন্তত কেউ স্বীকার করেনি। দু-তিনজন বলেছিল, সরিফন বিবি আগেই মারা গেছে। সরিফন বিবির যা ডেসক্রিপশন ছিল, তার

সঙ্গে আবার লক্ষ্মীমণি নামের একটি মেয়ের সঙ্গে অনেকটা মিলে যায়। কিন্তু সে প্রবল ভাবে অস্বীকার করে।

বর্ধন জিগ্যেস করলেন, সে যে মিথ্যে কথা বলছে না, তা তুমি ঠিক বুঝেছিলে?

ইয়েস স্যার। তাকে আমি অনেক ভাবে গ্রিল করেছি। এটা শিওর, সে মুসলমান নয়, হিন্দু।

কী করে বুঝলে?

যে গ্রামে তার বাড়ি, তার স্বামীর নাম, দুটি ছেলেমেয়ে আছে, এসব ট্রেস করা গেছে, সব মিলেছে। লক্ষ্মীমণি ডেফিনিটলি এক গরিব হিন্দু বাড়ির বউ ছিল। অন্য একটা গ্রামে সরিফন বিবি নামেও একজন হাউজ ওয়াইফের কথা জেনেছি, অনেকদিন তার কোনও খোঁজখবর নেই, সে গ্রামের লোকেরও ধারণা, সরিফন আর বেঁচে নেই। সে মেয়েটিও পাচার হয়ে গিয়েছিল। এদের কেউ কেউ মারাও যায়। লক্ষ্মীমণিও বার দু-এক মরতে-মরতে বেঁচে গেছে।

এই লক্ষ্মীমণি দিল্লির রাজেন্দ্রনগরের বাড়িতে ছিল, তা স্বীকার করেছে। তবু তুমি তাকে বেকসুর ছেড়ে দিলে।

তার কাহিনি শুনলে আপনিও ছেড়ে দিতেন স্যার।

আহা-হা, কবিরসাহেব, আমি তোমার মতন অত দয়ার অবতার নই। শোনো, এই লক্ষ্মীমণি। আর সরিফন এক হোক বা না হোক, একটা বীভৎস মার্ডারের সঙ্গে জড়িত। যে ছোকরাটি খুন হয়েছে, সে একটা বড় ব্যবসায়ীর বাড়ির ছেলে, দু-একজন মন্ত্রী-টন্ত্রীর সঙ্গেও যোগাযোগ আছে। ছেলেটা বড়লোকের বখাটে সন্তান, মদ-মেয়েমানুষ নিয়ে ফুর্তি করে টাকা ওড়াত, সে মরেছে, আপদ গেছে। কিন্তু খুনিকে তো শাস্তি দিতেই হবে। সেটা পুলিশের ডিউটি। এবার বলো, লক্ষ্মীমণির কাহিনিটা কী? এ-সব গল্পই তো একইরকম

হয়। গরিবের সংসার, আড়কাঠিরা তক্কেতক্কে থাকে, কোনও মেয়ের একটু স্বাস্থ্য ভালো দেখলে তাকে ভাগিয়ে নিয়ে বিক্রি করে দেয়। কিছু চালান হয়ে যায় অন্য দেশে।

না স্যার, এর কাহিনিটা অন্যরকম।

এই সময় দুর্লভ সিং এসে পড়ল, হাতজোড় করে নমস্কার করে বলল, সরি, সরি, আমার একটু লেট হয়ে গেল, ট্রাফিক জ্যাম ছিল।

বর্ধন বললেন, ঠিক আছে, বসো। চা-টা আসছে। তার আগে আমরা ওই লক্ষ্মীমণি নামের মেয়েটির ব্যাকগ্রাউন্ড শুনে নিই। কবির, তুমি হিন্দিতে বা ইংরিজিতে বলল, না হলে ও বুঝবে না।

দুর্লভ বলল, আমি কুছু কুছু বাংগালা বুঝি।

বর্ধন বললেন, কুছু কুছু বুঝলে তো হবে না। পুলিশের কাজে পুরোপুরি বুঝতে হবে। নাও, কবির, শুরু করো। সংক্ষেপে বলবে। লক্ষ্মীমণির স্বামী ছিল, ছেলেমেয়ে ছিল, কিন্তু প্রচণ্ড অভাব, ছেলেমেয়েদের খেতে দিতে পারে না, তাই আড়কাঠিদের প্রলোভনের ফাঁদে পা দিয়েছিল, তাই তো? তারপর?

কবির বললেন, না স্যার, ঠিক তা নয়। ওদের সংসারে অত অভাব ছিল না। সারা বছর মোটামুটি খাওয়া-পরা জুটে যেত। একটা ছেলে স্কুলেও পড়ত। লক্ষ্মীমণি রথের মেলা দেখতে যাওয়ার পথে পাচারকারিরা তাকে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে ধরে নিয়ে যায় ঠিকই, কিন্তু আসলে তার স্বামী ও শাশুড়ি বউটিকে আগেই বিক্রি করে দিয়েছিল ওদের কাছে।

গা ঝাড়া দিয়ে উঠে বসে বর্ধন বললেন, অ্যাঁ? বিক্রি করে দিয়েছিল? মেয়ে পাচার করার মতো মেয়ে বিক্রি করাও তো ক্রিমিনাল অফেনস! এটা জানার পরেও তুমি ওই শাশুড়ি আর স্বামীটিকে অ্যারেস্ট করোনি? হোয়াই? এ জন্যও তোমার নামে চার্জশিট দেওয়া যেতে পারে।

তা দিন। আসল ব্যাপার হচ্ছে, ওই শাশুড়ি আর স্বামী টাকার লোভে বউটাকে বিক্রি করেনি।

তবে কি বউটাকে পছন্দ হয়নি? সেও তো একই কথা।

না, স্যার, তাও নয়। শাশুড়ি আর স্বামী দুজনেই পরে কেঁদেছিল। স্বামীর একটা ছোট ভাই ছিল, তাকে সবাই ভালোবাসত। ছেলেটির নাম বিরাজ, সে লেখাপড়া শিখে চাকরিও করত। বিয়ে করেনি, সংসারটা প্রায় সে-ই চালাত। এই বিরাজের ক্যানসার ধরা পড়ল। ক্যানসারের চিকিৎসায় কত খরচ, তা আমরা সবাই জানি। আমাদের দেশে এই ধরনের পরিবারের কি ক্যানসারের চিকিৎসা করার সামর্থ্য থাকে? অথচ সবাই বাঁচতে চায়। ওরা কিছু-কিছু জমিজমা বিক্রি করে চিকিৎসা চালাল। তাতেও সুরাহা হল না। ছেলেটি দু-দিন ভালো থাকে, আবার শয্যাশায়ী হয়। কষ্টও পেয়েছে খুব। তখন ওদের হাতে বিক্রি করার মতন আর কিছু নেই, শুধু লক্ষ্মীমণির শরীর ছাড়া। মরিয়া হয়ে সেই পথই নিয়েছিল ওরা।

ছেলেটি শেষ পর্যন্ত বেঁচেছে?

সেটাই বড় ট্র্যাজেডি। বাঁচেনি। ততদিনে লক্ষ্মীমণি অনেক দূরে। তার জীবনও নষ্ট হয়ে গেছে। এটাই আমাদের দেশের একটা বাস্তব ছবি। এ জন্য আপনি কজনকে অ্যারেস্ট করবেন?

হুঃ!

তারপর লক্ষ্মীমণি বেশ কয়েকবার হাত বদল হয়ে, কয়েকবার মারা পড়তে-পড়তেও শেষ পর্যন্ত দিল্লির রাজেন্দ্রনগরের ওই বাড়ি থেকে পালিয়ে নিজেই পুলিশের হাতে আশ্রয় চায়। পুলিশই তাকে উদ্ধার করে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দেয়। দিল্লির পুলিশ এ ক্ষেত্রে খুব ভালো কাজ করেছে।

দুর্লভ এবার বলল, স্যার, আই বেগ টু ডিফার। গল্পটা এখানে মিলছে না। আমাদের কাছে স্পষ্ট রিপোর্ট আছে, সে মোটেই স্বেচ্ছায় ধরা দেয়নি। মার্ডার হওয়ার পরেও সে কয়েকদিন ওই বাড়িতে ছিল। তারও একমাস পরে করোলবাগের একটা ব্রথেলে পুলিশ রেইড করে। কয়েকজনকে উদ্ধার করে। তাদের মতে এই সরিফন বিবি কিংবা লক্ষ্মীমণি যাই-ই হোক, সেও একজন।

কবির বললেন, এই অংশটা সে আমার কাছে মিথ্যে বলেছে। এর আগের ঘটনাতেও সে কিছু কিছু মিথ্যে বলার চেষ্টা করেছিল।

বর্ধন বললেন, মিথ্যে তো বলবেই। একটা মেয়ে খেতে পাবে না, বিক্রি হবে, বারবার রেন্ড হবে, মার খাবে, অপমানের চূড়ান্ত হবে, তবু সে সবসময় সত্যকে আঁকড়ে ধরে রাখবে? মিথ্যে কিংবা ফ্যানটাসি তৈরি করবেই। সত্যি নামটা শুধু ভদ্রসমাজের একচেটিয়া সম্পত্তি, গরিবদের জন্য নয়।

দুর্লভ আর কবির দুজনেই হেসে ফেললেন।

কবির বললেন, আপনার এ কথাটা মানতে পারলাম না স্যার। সত্যি কথাটা মোটেই ভদ্রসমাজের একচেটিয়া সম্পত্তি নয়। বরং তারাই মিথ্যে কথা বেশি বলে। পলিটিশিয়ানদের দেখুন না। এমনকি আমরাও আমাদের বউয়ের কাছে...

বর্ধন বললেন, আই সাপোস, ইউ অল আর রাইট। যাক গে, মরুক গে, এবার বলো, লক্ষ্মীমণি সম্পর্কে তদন্ত কমপ্লিট না করে, এমনকি আমাকেও কোনও রিপোর্ট না দিয়ে তুমি তাকে ছেড়ে দিলে কেন?

স্যার, পুলিশের কাজ কি মানুষকে শাস্তি দেওয়া? মানুষকে বাঁচানোও নয়? যদি তাকে ঠিক পথে ফেরানো যায়, বেঁচে থাকার নতুন করে সুযোগ দেওয়া যায়?

কাম অন, ওসব বড়-বড় কথা আমাকে শোনাবার দরকার নেই। আমরা বিচারক নই, শুধু আইনের রক্ষক। আইন হচ্ছে অন্ধ। সাহেবদের দেশে দেখেছোই তো, জাস্টিস নামে একটা মেয়ের মূর্তি আছে, তার চোখ বাঁধা। কাজেই আমাদের কাছে বিচারের কথা বলো না, শুধু পদ্ধতির কথা বলল। কেন তাকে ছেড়ে দিলে?

এর মধ্যে ওমলেট, টোস্ট, চা ইত্যাদি এসে গেছে। খাওয়াও চলেছে।

বর্ধনের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আগে কবির কাতর চক্ষে তার দিকে তাকিয়ে বললেন, স্যার, চা পানের পর আর নিজেকে সামলাতে পারি না। আপনি পারমিশান দিলে একটা সিগারেট কি খেতে পারি?

বর্ধন বললেন, কী সিগারেট খাবে, প্যাকেটটা দেখি।

সেটা হাতে নিয়ে তিনি অনেকখানি ভুরু তুলে বললেন, তুমি একটা ডি আই জি র‍্যাঙ্কের পুলিশ অফিসার, তুমি এত বিশ্রী, সস্তা সিগারেট খাও? লোকে দেখলে কী বলবে বলো তো? বলবে, তুমি নিশ্চয়ই একটা ঘুষখোর, তাই এত গরিব সেজে থাকো। মাই ডিয়ার কবির সাহেব, পুলিশকে যে কতদিন থেকে কতরকম সমালোচনা সহ্য করতে হয়, তা তুমি জানো না? কিছু পুলিশ তো আছেই, যারা ডিজঅনেস্ট টু দা পাওয়ার অফ এক্সট্রিম, তাদের জন্য আমাদেরও অনেক বদনাম মাথা পেতে নিতে হয়। কাল থেকে ভালো সিগারেট খাবে। দাও, আমাকেও একটা দাও।

দুর্লভ বলল, শ্যাল উই কাম টু দা পয়েন্ট স্যার?

বর্ধন বললেন, ব্যস্ততার কিছু নেই। ধরে নাও, এখানেই আজ আমাদের অফিস হচ্ছে।

কবির বললেন, পুলিশ মাঝে-মাঝেই কিছু পাচার হওয়া মেয়েদের উদ্ধার করে। আমরা জেরা করি, খোঁজখবর নিই, তারপর তাদের ভাগ্যে কী হয়, সে সম্পর্ক কি আপনাদের কোনও অভিজ্ঞতা আছে? খুব সম্ভবত নেই, কিন্তু আমি জানি। নাইনটি নাইন পারসেন্ট

মেয়েদেরই আর তাদের বাড়িতে ফেরত নেওয়া হয় না। এ ব্যাপারে হিন্দু কিংবা মুসলমান সব সমান। যদি কোনও উদার পরিবার ফেরত নিতেও চায়, তা হলেও গ্রামের লোকেরা আপত্তি করে। সেইসব মেয়েদের তাড়িয়ে দেবেই। তারপর? আজকাল দু-একটি এন জি ও হয়েছে, তারা এইসব মেয়েদের নিয়ে কাজ করে। পুলিশ তাদের কাছেও সাহায্য চায়। কিন্তু সেই সব স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাই বা কী করবে, এত মেয়েদের আশ্রয় দেওয়ার মতন সংস্থান তাদের নেই। সরকারি কয়েকটা মহিলা আশ্রমেও সব মেয়ের জায়গা হয় না। আর প্রায় অধিকাংশ মহিলা আশ্রমেরই এতই অব্যবস্থা যে অনেক মেয়ে মনে করে, এর চেয়ে মরে যাওয়াও ভালো। অনেক মেয়েই পালায়। কোথায় পালাবে? বাঁচতে হবে তো। এবার তারা নিজেরাই আবার গিয়ে কোনও বেশ্যাপল্লীতে আশ্রয় নেয়। তারা পাকাপাকি যৌনকর্মী হয়ে যায়। আমি এর স্ট্যাটিসটি আপনাদের দেখাতে পারি।

বর্ধন বললেন, আঃ, বড় বেশি লেকচার হয়ে যাচ্ছে। জেনারেল ছেড়ে পার্টিকুলারে এসো। এই মেয়েটির কী হল?

লক্ষ্মীমণি সম্পর্কে তার শাশুড়ি আর স্বামীর খানিকটা সহানুভূতি থাকলেও তারা আর ওকে ফেরত নিতে পারবে না। গ্রামের লোকের বাধা তো আছেই। তা ছাড়া পাচারকারিরাও এসে টাকা ফেরত চাইবে। একমাত্র উপায়, যদি এই মেয়েদের কোনও চাকরি জুটিয়ে দেওয়া যায়।

দুর্লভ বলল, এদের কে চাকরি দেবে? এরা লেখাপড়া জানে না, হাউজ ওয়াইফ হিসেবে অন্য কোনও কাজও শেখেনি। তা ছাড়া যদি একবার জানাজানি হয়ে যায় সে যে একসময় প্রস্টিটিউট ছিল, তাহলে তাকে কেউ বাড়ির ঝিয়ের কাজও দেবে না। দিল্লিতে এরকমই হয়।

কবির বললেন, ইউ আর রাইট। বাংলাতেও একই রকম। সেইজন্যই আমি লক্ষ্মীমণির কেসটা কোর্টে তুলতে চাইনি, যাতে বেশি জানাজানি হয়। আমার এক লেখক বন্ধু আছেন, মিস্টার বিনায়ক ঘোষাল, তিনি ওর জন্যে একটা চাকরি ঠিক করে দিয়েছিলেন।

বর্ধন সাহেব আবার সোজা হয়ে বসে বললেন, বিনায়ক ঘোষাল? যে এমন সব কঠিন কঠিন কবিতা লেখে যার মাথামুণ্ডু কোনও মানেই বোঝা যায় না!

কবির বললেন, স্যার, বিনায়ক গল্প-উপন্যাসও লেখে, সেগুলো কিন্তু বুঝতে কোনও অসুবিধে হয় না।

বর্ধন বললেন, গল্প-উপন্যাস আমি পড়ি না। কবিতাগুলো পড়ে–

কবির বললেন, সে কি স্যার, আপনি গল্প-উপন্যাস পড়েন না, অথচ কবিতা পড়েন? সাধারণত এর উলটোটাই তো হয়।

বর্ধন বললেন, লম্বা-লম্বা গল্প-উপন্যাস পড়ার আমার সময় নেই। ছোটবেলা থেকেই কবিতা পড়ি, রবীন্দ্রনাথের অন্তত সাতশো কবিতা আমার মুখস্থ।

স্যার, আপনাদের ওই যে কী যেন বলে, দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ, আপনি দেখছি তাই। পুলিশ সার্ভিসে কেউ এত কবিতা পড়ে না। ইটস আ রেকর্ড!

চোপ! কাজের কথা বলো। তা সেই লেখক একটা এক্স-প্রস্টিটিউটকে কী কাজ দেবে? আমি তো ভেবেই পাচ্ছি না।

আমার বন্ধু বিনায়ক লক্ষ্মীমণির পুরো কেসটা জানে। তাকে আমি জিগ্যেস করেছিলাম, তুমি যদি এই মেয়েটিকে নিয়ে একটা গল্প লিখতে, তা হলে তার শেষ পরিণতি কী হবে? মেয়েটাকে কী ভাবে বাঁচাবে? বিনায়ক বলল, আমি ওকে নিয়ে গল্প লিখবই না। কারণ, ওকে বাঁচাবার কোনও রাস্তা আমি দেখতে পাচ্ছি না। যদি জোর করে বাঁচিয়ে দিই, ও একটা স্বাভাবিক জীবন ফিরে পায়, তা হলে সেটা হবে বাজে গল্প। পাঠকরা বলবে, ওটা উইশ ফুলফিলমেন্ট। ইচ্ছাপূরণ। অবাস্তব। ওরকম গল্প আমি লিখি না।

লেখকরা তো সব অবাস্তব গল্পই লেখে। কলমের খোঁচায় যাকে তাকে মেরে দেয়, আবার যাকে তাকে বাঁচায়। কনান ডয়েল যেমন শার্লক হোমসকে একবার মেরে দিয়েও আবার

বাঁচিয়ে তুলেছিলেন। ওসব লেখক-টেখকের কথা ছাড়। কাজের কথা বলো। সে এখন কোথায়?

না, স্যার, এই লেখকের একটা ভূমিকা আছে। বিনায়ক আমাকে বলেছিল, আমি লক্ষ্মীমণিকে নিয়ে গল্প লিখতে পারব না। কিন্তু বাস্তব জীবনে হয়তো কিছু সাহায্য করতে পারি। আমাকে দু-দিন সময় দাও। দু-দিন পরে সে সত্যিই একটা ব্যবস্থা করে দিল।

ব্যবস্থা মানে?

লক্ষ্মীমণির জন্য একটা কাজ জুটিয়ে দিল। সে এখন চাকরি করছে।

বর্ধন জুতো খুলে রেখেছিলেন, এবার জুতোয় পা গলাতে-গলাতে বললেন, চলো, চলো, তা হলে আর দেরি করা কেন? সে কোথায় চাকরি করছে? চলো, গিয়ে মেয়েটাকে ধরি।

কবির বললেন, দাঁড়ান, দাঁড়ান, স্যার। আর একটু কথা আছে।

আবার কী কথা? আমরা কি সারা সকাল বসে-বসে তোমার গল্প শুনব?

দুর্লভ বলল, আমাকে আজ সন্ধের ফ্লাইটেই দিল্লি ফিরে যেতে হবে। মেয়েটিকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া বিশেষ জরুরি।

কবির বর্ধনের দিকে তাকিয়ে বললেন, স্যার, মেয়েটিকে দিল্লি পাঠানো কি ঠিক হবে? এই স্টেজে?

বর্ধন রেগে উঠে বললেন, তার মানে? সে যদি দিল্লিতে একটা ক্রাইম করে থাকে, তা হলে ইনভেস্টিগেশানের জন্য তাকে তো পাঠাতেই হবে দিল্লিতে।

কবির বললেন, আমি তার সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ কথা বলে যা বুঝেছি, তার পক্ষে মানুষ খুন টুন করা একেবারেই সম্ভব নয়। সে একটা সাধারণ বাঙালি ঘরের সরল স্বভাবের মেয়ে।

বর্ধন বললেন, কবির, তোমার কি মনে হয়েছে না হয়েছে, সেটা এক্ষেত্রে খুব জরুরি নয়। দিল্লি পুলিশ যখন তাকে চাইছে, তুমি নিজের দায়িত্বে তাকে আটকে রাখতে পারো না।

দুর্লভ বলল, সে হয়তো নিজে খুন করেনি। কিন্তু সে একজন অ্যাকসেসরি, সে খুনের চিহ্ন লোপাট করতে সাহায্য করেছে। সেটাও একটা ক্রাইম। আসল দোষীকে খুঁজে বার করার জন্য তাকে জেরা করা খুব দরকার।

বর্ধন জিগ্যেস করলেন, সে মেয়েটি কী কাজ করছে এখন?

আমার বন্ধু এই লেখকের বউ একটা বাচ্চাদের স্কুলের হেডমিসট্রেস। সেই স্কুলে একজন আয়া কাম হেল্পিং হ্যাঁন্ডের পোস্ট আছে। লক্ষ্মীমণিকে সেই কাজ দেওয়া হয়েছে। সে মোটামুটি ভালোই মাইনে পায়, থাকার জায়গাও আছে ওখানেই, একমাত্র শর্ত, তার পূর্ব পরিচয় যাতে কেউ জানতে না পারে। বাচ্চাদের স্কুল তো! গার্জেনরা যদি শোনে, অমনি প্রথমে ফিসফাস, তারপর জোরাল আপত্তি...সেইজন্যই আমি চেয়েছিলাম, যাতে কোনও পাবলিসিটি না হয়...। স্যার, এ কাজটা আমি নিজের দায়িত্বে করেছি, এ জন্য যদি আমাকে কোনও শাস্তি দিতে হয় তো দিন। আমি আজই রেজিগনেশান সাবমিট করতে রাজি আছি।

বেশ কিছু মুহূর্ত তিনজনই নীরব।

একটা দীর্ঘশ্বাস টেনে বর্ধন বললেন, যাক গে, তোমার সম্পর্কে কী অ্যাকশান নেওয়া হবে, সেটা পরের ব্যাপার। আপাতত ওই লক্ষ্মীমণি না কী যেন, সেই মেয়েটিকে আমাদের চাই। এই খুনের কেসটার ব্যাপারে আমাদের জানতে হবে। সে কোথায়? তুমি জানো নিশ্চয়ই।

কবির বললেন, জানি, অবশ্যই। কিন্তু সে কথা আপনাদের বলব কিনা, তা ভেবে উঠতে পারছি না।

বর্ধন বললেন, হুমায়ুন, ইটস টু মাচ। তুমি একটা মেয়েকে আইন-টাইন না মেনেই ছেড়ে দিয়েছ। এখন, তুমি তার হোয়ার অ্যাবাউটস্ জেনেও আমাদের বলতে চাইছ না। এটা কি মামাবাড়ির আবদার নাকি? পুলিশ হয়ে এ কীরকম তোমার ব্যবহার?

কবির বললেন, স্যার, আমি পুলিশ ঠিকই। কিন্তু আমি একজন মানুষও তো বটে। আপনারা তো শুনেছেন যে সে একটা বাচ্চাদের স্কুলে আয়ার কাজ করে। তার কাজের বেশ সুনামও হয়েছে। তার ছেলেমেয়েরাও আসে তার কাছে। এখন একগাদা পুলিশ গিয়ে যদি তাকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে, তা হলেই তার পূর্ব পরিচয় জানাজানি হয়ে যাবে। তখন তার চাকরি রাখা মুশকিল হবে। সে একটা স্বাভাবিক জীবনযাপন করছে, আপনারা তাকে পাঠাবেন জেলে? মানুষকে সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে দেওয়াই কি আমাদের কাজ নয়? বর্ধন বললেন, তা বলে আইনের বাইরে তো আমরা যেতে পারি না। আইন অনুযায়ী সে যদি কোনও অপরাধ করে থাকে, তা হলে তাকে তো শাস্তি পেতেই হবে। মানবিক কারণে যদি তাকে ছেড়ে দিতে হয়, তবে পারেন শুধু বিচারক। পুলিশের সে অধিকার নেই।

২. ৩

সেন্ট মেরি কিন্ডারগার্টেন স্কুল নামটি যত ভারী, সেই তুলনায় স্কুলটি বেশ ছোট। একটি দোতালা বাড়ির একতলার পাঁচখানা ঘর ভাড়া নিয়ে স্কুলটি চলে। বাড়ির মালিক আর তাঁর স্ত্রী, দুজনেই বুড়ো-বুড়ি, থাকেন দোতলায়। তাদের তিন ছেলেমেয়েই থাকে বিদেশে। একটি মাত্র কাজের লোক, তারও বয়েস প্রায় ষাট।

একতলার ঘরগুলি ছাড়া পেছন দিকে রয়েছে একটা বেশ বড় উঠোন, তার একপাশে অনেকগুলি ফুলের টব। সেদিকেই দুটো বাথরুম, আর একটা ছোট ঘর, সঙ্গে এক টুকরো বারান্দা। সেই ঘরে থাকে সেই স্কুলের আয়া লক্ষ্মীমণি, বারান্দায় তার রান্নাঘর।

স্কুলের এক দারোয়ান ও একজন বেয়ারাও আছে। বেয়ারাটি রাত্তিরে থাকে না, দারোয়ানটি স্কুলের একটা ঘরেই শোয়।

স্কুলটি বড় রাস্তার ওপরে নয়, একটা গলির মধ্যে, তবে সেখান দিয়ে দুটো গাড়ি পাশাপাশি যেতে পারে। গলিটা যেখানে বড় রাস্তায় পড়েছে, সেখানে একটি পুরোনো আমলের রেস্তোরাঁ, চপ কাটলেট বিক্রি হয়।

সকালের দিকে এ রেস্তোরাঁয় বিশেষ কেউ আসে না। এখন বেলা এগারোটা, শুধু একটা টেবিলে তিনজন ব্যক্তি বসে আছে অনেকক্ষণ ধরে। দেখলে সাধারণ ভদ্রলোক বলেই মনে হবে। কোনও সন্দেহ করারই উপায় নেই যে এই তিনজনের মধ্যে দুজনই বেশ উচ্চপদের পুলিশ অফিসার, অন্যজনের বয়েস কম হলেও এসেছে দিল্লি থেকে।

ঘণ্টাখানেক কেটে গেছে, শুধু-শুধু বসে থাকা যায় না, কাপের পর কাপ চা অর্ডার দিয়ে যাচ্ছেন এঁরা।

বর্ধন বললেন, আর কতক্ষণ বসে থাকব? আর কত চা খাব? একটা চিংড়ির কাটলেট খেলে মন্দ হত না। ওহে কবির, দ্যাখো না, চিংড়ির কাটলেট পাওয়া যায় কিনা। তুমি দাম দেবে।

দোকানের মালিক বসে আছেন এক কোণের কাউন্টারে। কবির সেই দিকে চেয়ে বললেন, তিনটে চিংড়ির কাটলেট পাঠিয়ে দিন না।

মালিক ঘড়ঘড়ে গলায় বললেন, কাটলেট এখনও তৈরি হয়নি। কেক খাবেন?

বর্ধন ফিসফিস করে বললেন, ওই কেকগুলো কতদিনের বাসি, তা কে জানে। এত বেলাতেও চিংড়ির কাটলেট তৈরি হয় না, এ দোকান চালাবে কী করে? এ দোকান উঠে গিয়ে এখানে ওষুধের দোকান হল বলে!

দুর্লভ বলল, কেন, ওষুধের দোকান কেন? অন্য কোনও দোকানও হতে পারে।

বর্ধন বললেন, আমি দেখেছি, ওষুধের দোকানের কোনও মার নেই। যে পাড়াতেই খোলো, ঠিক চলবে, সব সময়ে দোকানে ভিড়।

বর্ধন হেসে বললেন, সেই ছাত্র বয়েসের পর আর কখনও...সে কতকাল আগের কথা, আমাদের নর্থ ক্যালকাটায় এরকম অনেক চায়ের দোকান ছিল...এ স্কুলটার কখন ছুটি হবে?

খুব সম্ভবত বারোটায়।

আরও এক ঘণ্টা এখানে বসে থাকতে হবে?

স্যার, আপনার মতন একজন এত বড় অফিসার এই সামান্য একটা কেস নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন, এ কথা শুনলেও তো কেউ বিশ্বাস করবে না। আপনি আর কেন বসে থাকবেন? যা করবার, আমরা দুজনেই ম্যানেজ করব।

কেন যে মাথা ঘামাচ্ছি, তা আমি নিজেই জানি না। মানবিকতা বনাম আইন। একটা অসহায় মেয়েকে সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে দেওয়া কিংবা তাকে জেলে পাঠানো। সিদ্ধান্ত নেওয়া খুব কঠিন। তবে কী জানো, এখানে বসে থাকতে বেশ মজাও লাগছে। যেন ছেলেবেলায় ফিরে গেছি। যে কাজ সাধারণ একজন সাব ইনস্পেকটরের করার কথা, সে কাজ নিয়ে বসে আছি আমরা তিনজন। মেয়েটি যদি দোষী না হয়, তাহলেও তার জীবনটা নষ্ট করে দেওয়ার অধিকার কি আমাদের আছে?

আরও দুকাপ করে চা পান করার পর স্কুলে ছুটির ঘণ্টা বাজল।

এই টেবিল থেকে স্কুলের প্রবেশদ্বারটি স্পষ্ট দেখা যায়। এর মধ্যে অনেক গার্জেন এসে ভিড় করেছেন সেখানে। তাদের মধ্যে মহিলাই বেশি।

কলকল করতে করতে বেরিয়ে আসতে লাগল ছেলেমেয়েরা। সঙ্গে-সঙ্গে রাস্তাটা যেন বর্ণময় হয়ে উঠল। বাচ্চাদের ঝলমলে হাস্যময় মুখ, মায়েদের কতরকম শাড়ির রং।

বর্ধন বললেন, মায়ের হাত ধরে একটা পাঁচ বছরের শিশু হাঁটছে, এটা পৃথিবীর একটা অন্যতম সুন্দর দৃশ্য। আমি এসে ভালোই করেছি। কতদিন একসঙ্গে এত বাচ্চা দেখিনি। আমার নাতনির কথা মনে পড়ছে। তার বয়েস চার বছর, দূর বিদেশে থাকে, আমি শুধু কমপিউটারে ছবি দেখি।

নানারকম রিকশা, গাড়িতে রাস্তাটা ভরতি হয়ে গেল।

আবার মিনিট দশেকের পর সব খালি।

এবার বেরুলেন শিক্ষয়িত্রীরা। মোট পাঁচজন। তারও একটু পরে প্রধান শিক্ষিকা।

কবির বললেন, ওই যে আমার বন্ধুর স্ত্রী বিশাখা। ওঁকে কি ডাকব? ওঁর সঙ্গে আগে কথা বলব?

কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করে বর্ধন বললেন না, থাক। এখনই ওঁকে কিছু বলার দরকার নেই। আগে মেয়েটির সঙ্গে কথা বলে দেখি। কী যেন ওর নাম, সরস্বতী না কালী?

লক্ষ্মীমণি। আমরা কি এবার স্কুল বাড়িটার মধ্যে ঢুকব?

সেটাও বোধহয় ঠিক হবে না। তুমি একা গিয়ে ওকে ডেকে আনতে পারবে?

তা পারব। কিন্তু আমরা কোথায় কথা বলব? এই চায়ের দোকানে?

ধ্যাৎ! তা আবার হয় নাকি? তোমার অফিসেও বোধহয় নিয়ে যাওয়া ঠিক হবে না। কেউ না কেউ উঁকিঝুঁকি মারবে!

দুর্লভ সিং খানিকটা বিরক্তভাবেই বলল, আমরা ওকে নিয়ে এত চিন্তা করছি কেন? এটা আমাদের অফিশিয়াল ডিউটি। ওকে অফিসে ডেকে নিয়ে জেরা করাই তো স্বাভাবিক। আমরা কি শুধু-শুধু সময় নষ্ট করছি না?

কবির বললেন, ইয়েস, আমাদের কিছুটা সময় নষ্ট হচ্ছে ঠিকই। কিন্তু আমরা এতটা সাবধান হচ্ছি, তার কারণ, আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করছি, যাতে ওকে বাঁচানো যায়। এখানকার সবাই জানে, একটা গ্রামের গরিব পরিবারের স্বামী-পরিত্যক্তা মেয়ে, অসহায় কিন্তু সৎ, এই স্কুলে আয়ার কাজ করছে। এই কাজ পেয়ে লক্ষ্মীমণি সুস্থভাবে বাঁচার অধিকার পেয়েছে। ওকে যে পাচারকারিরা ধরে নিয়ে গিয়েছিল, তারপর অনেক ঘাটের জল খেয়েছে, কিছুদিন বেশ্যাবৃত্তিও করেছে বাধ্য হয়ে, তা একবার জানাজানি হয়ে গেলে, সঙ্গে-সঙ্গে ওর চাকরি যাবে। ওর সামনে তখন আর দুটি মাত্র রাস্তা খোলা থাকবে। হয় বেশ্যাবৃত্তিতে আবার ফিরে যাওয়া অথবা আত্মহত্যা করা। কেউ কেউ আত্মহত্যাও করে। গত মাসেই এরকম একটা কেস হয়েছে।

বর্ধন নিঃশব্দে মাথা নাড়লেন।

দুর্লভ বলল, কিন্তু ও যদি একটা খুনের ব্যাপারে জড়িত থাকে, তাহলে তো ওকে শাস্তি পেতেই হবে। ওকে দয়া দেখাবার কি অধিকার আছে আমাদের?

কবির বললেন, শাস্তির যোগ্য হলে শাস্তি পেতেই হবে। ক্ষমা করার অধিকার আমাদের নেই, তা জানি। কিন্তু সত্যি সত্যি ও সেই অপরাধ করেছে কিনা, তা আগে এস্টাব্লিশ করা দরকার। সেইজন্যই আমরা যতদূর সম্ভব সাবধানে এগোতে চাই। একটা পুরুষমানুষকে থানায় ডেকে নিয়ে জেরা করলে মানুষ কিছু মনে করে না। কিন্তু একটা মেয়েকে...মানুষের মনে একবার সন্দেহ ঢুকলে আর যায় না।

বর্ধন রাস্তার দিকে তাকিয়ে বললেন, স্কুল বাড়ি থেকে এখন যে বেরিয়ে আসছে, সে

কবির এক পলক দেখেই বললেন, ওই তো লক্ষ্মীমণি!

বর্ধন বললেন, এই রে, ও কোথায় যাচ্ছে?

কবির বললেন, হাতে একটা থলে। খুব সম্ভবত বাজারে। তরকারি-টরকারি কিনবে।

বর্ধন বললেন, বারোটা বেজে গেছে। এখন কেউ বাজারে যায়? এখন কী পাবে?

কবির বললেন, স্যার, গরিব মানুষরা এই সময়েই বাজারে যায়। এখন ঝড়তি-পড়তি জিনিস পাওয়া যায় সস্তায়। একটু-একটু পচা মাছ বিক্রি হল জলের দরে।

বর্ধন উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আরে, ও বাজারে ঢুকে পড়লে আমরা আর ওকে পাব কী করে? ওকে এক্ষুনি ধরতে হবে।

টেবিলের ওপর চায়ের দাম রেখে ওঁরা হুড়মুড়িয়ে বেরিয়ে এলেন বাইরে।

লক্ষ্মীমণি ওঁদের সামনে দিয়েই চলে গেল।

তিনজন হাঁটতে লাগলেন তার পিছু পিছু।

কয়েক পা গিয়েই থেমে গিয়ে বর্ধন বললেন, একটা মেয়েকে ফলো করব আমরা তিনজন মদ্দা, পাড়ার লোক আমাদেরই না মেয়ে-ধরা মনে করে পিটুনি দিতে শুরু করে।

নিজের রসিকতায় তিনি নিজেই জোরে হেসে উঠলেন।

কবির বললেন, আপনারা দাঁড়ান স্যার, আমি ওর সঙ্গে কথা বলছি।

তিনি এগিয়ে গেলেন দ্রুত পায়ে।

লক্ষ্মীমণি এক জায়গায় রাস্তা পার হওয়ার জন্য দাঁড়িয়েছে। কবির তার পাশে এসে যেন হঠাৎ দেখতে পেয়েছেন, এই ভাবে বললেন, আরে, তুমি সেই লক্ষ্মীমণি না? আমায় চিনতে পারছ?

লক্ষ্মীমণি মোটেই ভয় পেল না কবিরকে দেখে। খুব স্বাভাবিকভাবে বলল, কেন চিনব না! আপনিই তো সেই সাহেব, আমার প্রাণ বাঁচিয়েছেন!

ঝট করে ঝুঁকে সে কবিরের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল।

কবির বললেন, তুমি তো একটা চাকরি করো, তাই না? এখানেই থাকো?

লক্ষ্মীমণি বলল, হ্যাঁ, সাহেব, ইস্কুলেই আমাকে থাকার একটা জায়গা দিয়েছে। আমি আর যাব কোথায়?

তুমি একাই থাকো?

জি। নিজেই বেঁধেবেড়ে খাই।

এখন বাজারে যাচ্ছ?

জি, দেখি যদি কিছু চুনো মাছ পাই। আজ আমার সোয়ামি দেশ থেকে রাতে আসবে। আমার হাতের রান্না খেতে চায়। যেদিন আসে, খেয়েদেয়েই যায়।

কবির একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। এর স্বামী একে বিক্রি করে দিয়েছিল। কোনওক্রমে উদ্ধার পেয়ে এ ফিরে এসেছে, কিন্তু এর স্বামী-শাশুড়ি আর একে ফেরত নেবে না। নিজেদের সংসারে স্থান দেওয়ারও প্রশ্ন নেই। তবু সেই স্বামীটি এর সঙ্গে দেখা করতে আসে, এখানে খেয়ে যায়, কিছু টাকাও নেয় বোধহয়। মানুষ আর কত নির্লজ্জ হৃদয়হীন হতে পারে। আর বাঙালি মেয়েরা সহ্য করে নেয় সবকিছু।

কবির বললেন, শোনো, তোমার সঙ্গে একটু দরকার আছে। তুমি আমাদের কাছে যা স্টেটমেন্ট, মানে ইয়ে যে এজাহার দিয়েছিলে, তার সবটা লিখে রাখা হয়নি। আমাদের রেকর্ড রাখতে হয়। তাই তুমি চলো আমার সঙ্গে, বেশি না, ঘণ্টাখানেকের জন্য। আমার সঙ্গে গাড়িতে উঠবে?

লক্ষ্মীমণি এস্তভাবে বলল, না, না সাহেব, আপনার সঙ্গে গাড়িতে যেতে পারব না। এদিককার দোকানের লোকেরা আমাকে চেনে, তারা কে কী ভাববে! কোথায় যেতে হবে বলুন, আমি নিজেই চলে যাব।

কবির বললেন, সেটাই ভালো। তুমি বরং, এখান থেকে ওই বাসে ওঠো। টিকিট কাটার সময় বলবে, ন্যাশনাল লাইব্রেরি। বলতে পারবে? জাতীয় গ্রন্থাগার, এটা মনে রাখতে পারবে? আচ্ছা থাক, বলবে চিড়িয়াখানা। সেখানে বাস থামলেই নেমে পড়ো। ভালো করে জিগ্যেস করে চিড়িয়াখানায় নামবে।

লক্ষ্মীমণি ঘাড় হেলিয়ে বলল, আচ্ছা।

কবির ওর বাসে ওঠা পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন রাস্তার এপারে।

সেই বাসে চিড়িয়াখানায় পৌঁছবার আগেই কবিরদের গাড়ি সেখানে উপস্থিত। লক্ষ্মীমণি বাস থেকে নামতেই কবির বললেন, এবার তুমি গাড়িতে ওঠো, এখানে কেউ তোমায় চিনবে না।

সে গাড়িতে ওঠার পর বর্ধন বললেন, হুঁ, তোমারই নাম পদ্ম? বয়েস তো বেশি না? তোমার দুটো ছেলেমেয়ে থাকে কী করে?

লক্ষ্মীমণি হি হি করে হেসে উঠল।

কবিরও মৃদু হেসে বললেন, স্যার, এর নাম পদ্ম নয়, লক্ষ্মী। ওর বয়েস প্রায় বত্রিশ। এই বয়েসের মেয়ের দুটি ছেলেমেয়ে তো থাকতেই পারে। গ্রামের এইসব মেয়ের তো বিয়েই হয় চোদ্দ-পনেরো বছর বয়সে।

বর্ধন বললেন, চাইলড় ম্যারেজ? ভেরি ব্যাড, ভেরি ব্যাড।

এর মধ্যেই ঠিক করা হয়েছিল, বসা হবে বর্ধন সাহেবের বাড়িতে। গাড়ি ঢুকল গেট দিয়ে। বিশাল কমপ্লেক্স। পঁচাশিখানা ফ্ল্যাট, বর্ধনেরটা চোদ্দ তলায়।

লিফট দিয়ে ওপরে উঠে আসার পর লক্ষ্মীমণি একেবারে থ। কোনও বাড়ির এত উঁচুতলায় সে কখনও আসেনি। জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল।

বর্ধন বললেন, ওই যে দেখতে পাচ্ছ, গঙ্গা? আর ওই সেতুটার নাম বিদ্যাসাগর ব্রিজ।

লক্ষ্মীমণি এবার বলল, গঙ্গা নদী? রোজ ঘুম থেকে উঠেই আপনি মা গঙ্গাকে দেখতে পান? তা হলে আপনার খুব পুণ্য হয়।

বর্ধন বললেন, পুণ্য? কী জানি। পুলিশের চাকরিতে তো শুধু পাপই জমে ওঠে।

খাওয়ার ঘরে গোল টেবিলটাতেই বসা হল। লক্ষ্মীমণি কিছুতেই এত বড়-বড় সাহেবদের সামনে চেয়ারে বসবে না, সে দাঁড়িয়েই থাকতে চায়।

বর্ধন ধমক দিয়ে তাকে জোর করে বসালেন।

তারপর তিনি বললেন, সকাল থেকে চা খেয়ে আমাদের পেট ঢোল হয়ে গেছে, আর চা চলবে না। এখন ডিউটির সময় বিয়ারও খাওয়া যাবে না। সুতরাং কিছু অফার করছি না।

দুর্লভ বলল, স্যার, আগে আমাদের কাজটা সেরে নেওয়া হোক।

কবির বললেন, শোনো লক্ষ্মী, আমি তোমায় কয়েকটা প্রশ্ন জিগ্যেস করব। বাংলায় বলে তারপর এনাকে ইংরিজিতে বুঝিয়ে দেব। তোমার সঙ্গে যখন আমার শেষ কথা হয়, তখন তুমি আমাকে দুটো-একটা মিথ্যে বলছিলে কী?

সবাইকে অবাক করে দিয়ে, অস্বীকার না করে, সঙ্গে-সঙ্গে সে উত্তর দিল, তা বলেছি। বোধহয়!

কবির বললেন, কেন বলেছিলে, আমরা তো তোমার ওপর কোনও জোর-টোর করিনি?

লক্ষ্মী বলল, কী জানি কেন। মাঝে-মাঝে মুখ দিয়ে এমনিই বেরিয়ে আসে। তা ছাড়া সব সত্যি কথা বললে অনেকে বিশ্বাস করে না।

বর্ধন এক হাতে নিজের থুতনি ঘষতে ঘষতে বললেন, তা ঠিক, সত্যিটাই অনেক সময় বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না। সামটাইমস ট্রুথ ইজ স্ট্রেঞ্জার দ্যান ফিকশান।

কবির জিগ্যেস করলেন, কলকাতায় ফিরে আসার আগে, তুমি দিল্লির রাজেন্দ্রনগরের একটা বাড়িতে ছিলে। তাই তো?

হ্যাঁ বাবু, সেটা বেশ বড় বাড়ি। পাকা বাড়ি। রান্নাঘরের পাশে ফিরিজ ছিল।

সে বাড়ি ছাড়লে কেন?

ওরে বাবারে, সে বাড়িতে একদিন যে একটা মানুষ খুন হল। ভাবলেও এখন গায়ে কঁটা দেয়। একজন বাবু আর একজন বাবুকে গুলি করে খুন করল। তারপর সে খুনিবাবুটা দুমদুম করে গুলি চালাতে-চালাতে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল। তাই দেখে ভয়ে আমি দৌড় লাগালাম। আমার জামা কাপড় সব ফেলে–

দুর্লভ বলল, এটাও ঠিক নয়। সহদেব আচারিয়া গুলিতে খুন হয়নি। তার বডিতে কোনও বুলেট উন্ড ছিল না, মাথাভরতি কাঁচ।

কবির লক্ষ্মীকে জিগ্যেস করলেন, তুমি যে বাইজিটির কাছে কাজ করতে, তার ঘরেই খুন হয়েছিল। তুমি তখন ছিলে সে ঘরে? খুনটা নিজের চোখে দেখেছ?

না, আমি তখন ঘরের বাইরে। গুলির আওয়াজ শুনেছি। তারপর একটা বাবু বন্দুক হাতে বেরিয়ে এল।

সেই দুই বাবুর চেহারা তোমার মনে আছে? কেমন চেহারা ছিল?

বাবুদের চেহারা যেমন হয়। সুন্দর মতন, ফরসা, একজনের মাথা-ভরতি চুল, অন্যজনের। একটু-একটু টাক। একজন সিল্কের পাঞ্জাবি পরা, হাতে একটা লোহার বালা। অন্যজন প্যান্টুল আর জামা

যার হাতে লোহার বালা, সে-ই তো খুন হল?

না, না। অন্য বাবুটা। যার হাতে লোহার বালা, সেই তো ঘর থেকে বেরিয়ে এসেও গুলি চালাতে লাগল, আমি তখন ভয়ে এক কোণে

দুর্লভ বলে উঠল, রং রং। সহদেব আচারিয়ার হাতেই লোহার বালা ছিল। খুন হয়েছে। সে। ডেডবডিতেও সেই লোহার বালা ছিল।

কবির লক্ষ্মীকে জিগ্যেস করলেন, তোমার ঠিক মনে আছে? সিঁড়ি দিয়ে কে নেমে এসেছিল?

লক্ষ্মী ঘাড় কাৎ করে জোর দিয়ে বলল, স্পষ্ট মনে আছে বাবু, ঘরের মধ্যে অন্য লোকটা মরে পড়ে রইল, আর এই লোকটা ধুতি আর কুর্তা পরা, ধুতি খুলে গেছে, ষাঁড়ের মতন চাঁচাতে চাচাতে সিঁড়ি দিয়ে নামছে। এই বাবুটাকে তো আগেও দু-তিনবার দেখেছি ও বাড়িতে, সেই লোহার বালা পরত। একদিন ওই লোহার বালা দিয়ে সোডার বোতলের ছিপি খুলেছিল।

কবির এবার মুখ ফিরিয়ে দুর্লভকে জিগ্যেস করলেন, ডেডবডির পোশাক কী ছিল?

দুর্লভ মাথা নেড়ে বলল, ধুতি কুর্তা। হাতে লোহার বালা।

কবির বললেন, তা হলে, অ্যাকরডিং টু লক্ষ্মী, যে খুন হয়েছিল, সে শিউলাল ঝা। কিন্তু শিউলাল তো খুন হয়নি। সে কয়েকদিন পরে নিজেই এসেছিল থানায়–

দুর্লভ বলল, খুন তো হয়েছিল একজন, সেটা শিওর। ডেডবডি পাওয়া গেছে। সময়টাও মিলে গেছে।

বর্ধন বললেন, সব কিছুই যে গুলিয়ে যাচ্ছে হে।

টেবিলের ওপর রাখা একটা কাচের জার থেকে তিনি একটা গেলাশে জল ঢালতে গেলেন। জলভরতি ভারী জারটা তিনি ধরে রাখতে পারলেন না, সেটা পড়ে গেল মেঝেতে। বিকট শব্দে সেটা টুকরো-টুকরো হয়ে গেল, জল গড়াতে লাগল চারদিকে।

বর্ধন বললেন, এঃ হে, হে। মনার মা, মনার মা

একজন স্থূলাঙ্গিনী মহিলা বেরিয়ে এলেন ভেতর থেকে। বর্ধন কিছু বলার আগেই তিনি বকুনি দিয়ে বললেন, আবার ভেঙেছেন? এই নিয়ে তিনটে ভাঙল একমাসে। কী করে করেন!

বর্ধন একটু অপ্রস্তুত ভাবে বললেন, পড়ে গেল, কী করব। একটা ঝটা আনো–

এর মধ্যেই লক্ষ্মীমণি পাশের বাথরুমে ঢুকে একটা ঝাটা আর একটা ঘর মোছা ন্যাতা গোছের নিয়ে এল। পরিষ্কার করতে শুরু করল উবু হয়ে বসে।

বর্ধন তাকে বললেন, আরে, আরে, তুমি ওসব কী শুরু করলে? ওঠো-ওঠো।

লক্ষ্মীমণি অবাক হয়ে বলল, পরিষ্কার করব না? ভাঙা কাঁচ, যদি পায়ে ফোটে!

মনার মা রান্নাঘরে কিছু একটা চাপিয়ে এসেছিল, সেটা সামলে আবার ফিরে আসার মধ্যেই লক্ষ্মীমণি নিপুণ হাতে সব কাঁচ একপাশে সরিয়ে জল মুছে ফেলেছে।

কবির তাকে বললেন, ঠিক আছে, হয়েছে। এবার উঠে বসো

দুর্লভ বলল, স্যার, এবার আমি ওকে জেরা করতে পারি? তুম হিন্দি সামঝো?

লক্ষ্মী বলল, হিন্দি? একটু একটু।

দুর্লভ হিন্দিতে জিগ্যেস করল, তুমি গীতা চাওলা বলে কারুকে চেনো?

দু-দিকে মাথা নেড়ে লক্ষ্মীমণি বলল, না।

তুমি যার কাছে কাজ করতে, তার নাম কী?

জানেমন বিবি।

নাম ভাঁড়িয়ে থাকতে পারে। তার চেহারা কেমন?

পাতলা পানা। খুব ফরসা। কোমরটা খুব সরু আর বুকের এই জাগাটা, বেশ চওড়া। ঠোঁট সব সময় লাল। মাথার চুল একটু কুঁকড়া কুঁকড়া।

গীতা চাওলার সঙ্গে পুরোপুরি মিলে যাচ্ছে। তার ঘরে একজন খুন হয়েছিল। তুমি বললে, হাতে বালা পরা সহদেব আচারিয়া তার দোস্ত শিউলাল ঝা-কে খুন করে পালিয়ে যায়। এটা ঠিক নয়। শিউলাল ঝা বেঁচে আছে। তা হলে তুমি মিথ্যে বলছ কেন?

মিথ্যে তো বলিনি। যা দেখেছি, তাই বললাম। ধুতি পরা বাবুটাকেই আমি বন্দুক হাতে সিঁড়ি দিয়ে নামতে দেখলাম।

ঠিক আছে। সেটা আমরা পরে সম্ভ করব। সেই খুনের ঘটনার পর তুমি ওই বাড়িতে কতদিন ছিলে?

থাকি নাই তো? ভয়ে দৌড় দিছি।

কবির বললেন, তুমি স্টেটমেন্ট দিয়েছিলে, ওই বাড়ি থেকে বেরিয়ে সোজা দৌড়ে বেরিয়ে গিয়ে পুলিশের কাছে আশ্রয় চেয়েছিলে। এখন দেখা যাচ্ছে, তোমার এ কথাটাও সত্যি নয়।

লক্ষ্মীমণি চুপ করে রইল।

দুর্লভ বলল, অফ কোর্স মিথ্যে কথা। রেকর্ডে আছে, ওই ঘটনার সাতদিন পর দিল্লি পুলিশ একটা স্মাগলারদের ডেন রেইড করে পাঁচটি বাংগালি মেয়েকে উদ্ধার করে।

তাদের মধ্যে একজন ছিল সরিফন বিবি। এখন অবশ্য শোনা যাচ্ছে, সরিফন বিবি আগেই ডেড। তার বদলে এই মেয়েটি ছিল সেই দলের মধ্যে।

কাচের জারটি ভাঙার লজ্জা কাটিয়ে ওঠবার জন্য বর্ধন নিজেই এবার জিগ্যেস করলেন, তুমি পুলিশের কাছে নিজে ধরা দাওনি?

লক্ষ্মী বলল, না।

বর্ধন আবার বললেন, তবে, এই মিথ্যেটি বলেছিলে কেন?

বড়বাবু, পুলিশের কাছে কি নিজে যাওয়ার সাহস আছে। পুলিশের নামেই তো বুকটা কাঁপে। ওই সব খুন-জখমের ব্যাপার দেখে বুকটা ধড়াস-ধড়াস করছিল। আমি আর গোলাপি নামে আর একজন দৌড়ে-দৌড়ে রাস্তায় এদিক-ওদিক ঘুরি। গোলাপি বলল, সে আগে একটা বাড়িতে কাজ করত, সেখানে গেলে থাকা যাবে, তাই একটা অটো রিকশা চেপে চলে গেলাম সেখানে। সেখানেই লুকিয়ে ছিলাম। সাতদিন পর পুলিশ আমাদের উদ্ধার করে। পুলিশ তখন খুনের কথা কিছু বলে নাই, আমরাও মুখ খুলি নাই।

দুর্লভ বলল, স্যার, ওর এই কথাটাও মিথ্যে। খুনের পর আরও অন্তত চারদিন এই মেয়েটি সেই বাড়িতেই ছিল। এর ঘরের মেঝেতেই মেঝেটা খুঁড়ে লাশটা পুঁতে রাখা হয়েছিল। একটা খাট পেতে ঠান্ডা মাথায় এ সেখানে শুয়ে থেকে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়েছিল।

কবির বলেন, এটাই সত্যি, তাই না?

লক্ষ্মীমণি খানিকটা বিভ্রান্ত ভাবে বলল, আমি? সেখানে শুয়েছিলাম? না, না, আমি না, আমি না। সরিফন হতে পারে। সরিফন আমাদের সঙ্গে পালায়নি।

সরিফন বিবি? তুমি যে বলেছিলে, সরিফনকে তুমি চেন না? সরিফন তোমাদের সঙ্গে একই বাড়িতে ছিল। আগে তো একবারও বলনি?

লক্ষ্মীমণি তিনজনের মুখের দিকে পর্যায়ক্রমে তাকিয়ে বলল, বলি নাই ঠিকই। যখন ও লাইনে ছিলাম, তখন আমাদের বারবার করে শিখায়ে দিয়েছিল, একজন কেউ ধরা পড়লে কিছুতেই অন্যদের নাম বলবে না। পুলিশ জিগ্যেস করলেও বলবে না। তা ছাড়া, আপনে বলছিলেন সরিফন বেঁচে নাই। তাই আর কিছু বলি নাই।

দুর্লভ বলল, স্যার, যা বোঝবার বুঝে গেছি। এ মেয়ে অতি তুখোড় মিথ্যেবাদী। খুনের পর লাশটা গায়েব করার ব্যাপারে এ নিশ্চিত সাহায্য করেছে। এখন ওকে অ্যারেস্ট করা ছাড়া আর কোনও উপায় নেই।

কবির বললেন, লক্ষ্মীমণি, আমরা আর তোমার কোনও কথায় বিশ্বাস করতে পারছি না। খুনের পরেও তুমি ওই বাড়িতে...

লক্ষ্মীমণি এবার আর্ত গলায় চিৎকার করে বলল, না, আমি না, আমি না। বিশ্বাস করেন, মা কালীর দিব্যি। ওই বাবুটা যখন গুলি চালাইলো, তারপর আর দশ মিনিটও সেই বাড়িতে থাকি নাই। আর কোনওদিন সেদিকে যাই নাই। সরিফন ছিল, তার শরীর খারাপ, খুব জ্বর, আর ওই বাড়িতে দারোয়ানের সঙ্গে তার আশনাই ছিল, তাই সে আসতে চায় নাই।

দুর্লভ বলল, আর কি কথা বাড়াবার দরকার আছে! এবার এই মেয়েটিকে আপনারা দিল্লি পুলিশের হাতে ছেড়ে দিন।

কবির খানিকটা বিরক্ত ভাবেই বললেন, লক্ষ্মী, তোমাকে এখন দিল্লিতে যেতেই হবে। আমাদের আর তোমাকে আটকে রাখার উপায় নেই।

হুহু করে চোখ ফেটে জল এল লক্ষ্মীর। সে হাউহাউ করে কাঁদতে কাঁদতে বলল, না, না, আমি আর দিল্লিতে যাব না! আবার আমি ওই চক্করে পড়তে চাই না। এখন আমি কত শান্তিতে আছি, আমার স্বামী আমাকে নেয় না, আমার ছেলেমেয়েকে কাছে পাই না। তবু,

তবু, খেয়ে পরে মানসম্মান নিয়ে বেঁচে আছি। ইস্কুলের চাকরিটা আমার কী ভালো যে লাগে, ছোট ছোট সব দুধের ছেলেমেয়ে, তাদের মুখগুলি দেখলেও শান্তি লাগে, আমি আর কিছু চাই না–

চেয়ার থেকে নেমে মাটিতে হাঁটুগেড়ে বসে সে হাত জোড় করে বলতে লাগল, এই কয়টা বছর, কত অপমান সয়েছি, কত মার খেয়েছি, আমার এই শরীরটা নিয়ে কত অত্যাচার হয়েছে, এখন বাবুগো, যেটুকু শান্তি পেয়েছি, সেটুকু বাপ-মায়ের নামে কিরে কেটে বলছি, ওই খুনের ব্যাপারে আমি আর কিছু জানি না–

অন্য তিনজন পুরুষই নীরব। তাদের মুখ পাথরের মতন।

কাঁদতে কাঁদতে একই কথা বলতে বলতে লক্ষ্মীমণি হঠাৎ একসময় থেমে গেল। আঁচল দিয়ে চোখমুখ মুছে একেবারে শান্ত গলায় বলল, ঠিক আছে, আমারে ধরে নিয়ে যান। দুই হাত বাঁধুন। পুলিশ একবার দিল্লিতে নিয়ে গেলে আমার কী যে হবে জানি না। আমারে জেলে দিন। ফাঁসি দিন। মেয়েমানুষ হয়ে জন্মেছি, লেখাপড়া শিখিনি, পুরুষমানুষ আমাদের নিয়ে যা খুশি করতে পারে, বিয়ে করেও আবার বিক্রি করে দিতে পারে, আড়কাঠিরা যেখানে-সেখানে ঠেলে দেয়, প্রতিটি রাত্তিরেই সারা শরীরটা ভয়ে কাঁটা হয়ে থাকে। কখনও মরতে চাইনি, তবু মরলেই বুঝি আসল শান্তি। আমারে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দিন, এ পৃথিবী থেকে এক আপদ বিদায় হবে। হ্যাঁ, আমিই সেই বাবুটারে খুন করেছি। আর কেউ দোষী নয়। আমি, আমি, আমি! আমার জীবনের কোনও দাম নেই!

বর্ধন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, এটা যদি অভিনয় হয়, তা হলে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর পুরস্কারটা অন্তত ওকে দেওয়া উচিত।

২. ৪

দিল্লিতে চিত্তরঞ্জন পার্কে একটা গেস্ট হাউজে উঠেছেন কবির খান। এ শহরে তাঁর প্রচুর বন্ধুবান্ধব আছে, কিন্তু কারুকেই খবর দেননি। এবারে তাঁর কাজটা অনেকটাই গোপন।

যদিও পুলিশেরই কাজ কিন্তু ঠিক সবরকম আইন-নিয়ম মেনে চলা হচ্ছে না। বেশি জানাজানি না হওয়াই ভালো।

কবির এখানে পৌঁছেছেন রাত আটটার একটু পরে। এপ্রিল মাসে দিল্লির আবহাওয়া অতি চমৎকার। অনেকেই এ সময় বাইরে বেরিয়ে পড়ে।

দুর্লভ সিং আসবে নটার সময়। এর মধ্যে বেজে উঠল কবিরের মোবাইল ফোন।

তাঁর বন্ধু বিনায়ক।

বিনায়ক জিগ্যেস করলেন, হুমায়ুন, তুমি কোথায়? তোমার বাড়িতে ফোন করলাম, কেউ ধরল না। তুমি কলকাতায় নেই?

কবির বললেন, না, আমি দিল্লিতে এসেছি।

বিনায়ক বললেন, এক্সসেলেন্ট! আমি কোথায় বলো তো?

কবির বললেন, তুমিও দিল্লিতে নাকি?

বিনায়ক বললেন, ঠিক প্রপার দিল্লি নয়। গুরগাঁও-তে একটা চমৎকার হোটেলে। তুমি চলে এসো। অনেকদিন বাদে ভালো করে আড্ডা দেওয়া যাবে।

এখন তো যাওয়ার উপায় নেই। আমি দিল্লি এসেছি একটা জরুরি কাজ নিয়ে। সেই ব্যাপারেই...

রাত আটটার পরেও কাজ? চলে এসো, চলে এসো! আমার কাছে একটা ভালো হুইস্কি আছে।

এখন সত্যিই যেতে পারছি না। এখানকার পুলিশের একজন আসবে একটু পরে।

হুমায়ুন, তুমি দেখছি প্রমোশন পাবেই পাবে। এত কাজ!

বিনায়ক, তুমি কদিন থাকচ্ছ? তুমি কাল সকালে চলে এসো বরং। তোমাকে আমি একটা গল্প শোনাতে পারব। সে গল্পের অর্ধেকটা তুমি জানো–

তার মানে? কোন গল্প?

লক্ষ্মীমণি নামে একটি মেয়ের কথা তোমার মনে আছে? তোমার স্ত্রী যাকে চাকরি দিয়েছেন তাঁর স্কুলে?

হ্যাঁ, মনে থাকবে না কেন? বিশাখার কাছ থেকে আমি মাঝে-মাঝে রিপোর্ট পাই। সে তো ভালোই কাজ করছে। বাচ্চাদের খুব ভালোবাসে, যত্ন করে। শি ইজ নাও সেটেল ইন লাইফ।

সে সবই তো ঠিক ছিল। এখন দিল্লি পুলিশ তাকে আবার চাইছে। লক্ষ্মীমণি যা স্টেটমেন্ট দিয়েছিল, তাতে গণ্ডগোল ছিল কিছু কিছু। একটা মার্ডারের ব্যাপারে তাকে অ্যাকসেসরি হিসেবে সন্দেহ করা হচ্ছে।

তাকে দিল্লিতে ধরে এনেছ? তার মানে, তার চাকরি যাবে। সে আর ফিরতে পারবে না। তরে জীবনটা শেষ পর্যন্ত নষ্টই হবে। ছি ছি ছি, তোমাদের পুলিশদের কি মানবিকতা বোধ বলে কিছু থাকতে নেই?

দাঁড়াও, দাঁড়াও, অত উত্তেজিত হচ্ছ কেন? না, তাকে দিল্লি আনা হয়নি। ডেফিনিট প্রমাণ না পেলে যাতে তাকে অ্যারেস্ট করা না হয়, সেই চেষ্টাই এখনও করে যাচ্ছি। তাকে বাঁচাবার চেষ্টা করবার জন্যই আমাকে দিল্লিতে আসতে হয়েছে।

এখানকার বাঙালিরা আমাকে একটা সম্বর্ধনা দেওয়ার জন্য ডেকে এনেছে। কাল আমি সময় পাব না। পরশুদিন ফিরে যাওয়ার কথা। আজ সন্ধেটাই ফাঁকা ছিলাম। এরপর আর তোমার সঙ্গে দেখা করার সময় পাব কি না বলতে পারছি না।

ঠিক আছে, আমি তোমায় ফোন করব।

কবিরের সঙ্গেও একটা স্কচের বোতল আছে। হাত-মুখ ধুয়ে নিয়ে তিনি একটা গেলাশ নিয়ে বসলেন। টিভি খুলতেই দেখা গেল জবর খবর। দিল্লির খান মার্কেটে বিকেলবেলা দু বার বম্ব ব্লাস্ট হয়েছে। মৃত্যু হয়েছে এগারোজনের।

কবিরের মুখটা কুঁকড়ে গেল। এইরকম যখন-তখন বোমার আক্রমণ এখন অনেকটা জল ভাত হয়ে গেছে। অথচ বারবার নিরীহ মানুষই তো মরে। আজকের নিহতদের মধ্যে রয়েছে দুটি কিশোর-কিশোরী, মা-বাবার সঙ্গে তারাও বাজারে এসেছিল।

টিভিতে বলছে, এর পেছনে রয়েছে ইসলামি জেহাদি একটি দল। কিন্তু এরকম অকারণ নরহত্যার সমর্থন ইসলামে কোথাও নাই। এরকম ঘটনার কথা জানলে শুধু দুঃখ নয়, রাগেও কবিরে শরীর জ্বলতে থাকে।

দুর্লভ এল ঠিক কাঁটায়-কাঁটায় নটার সময়।

প্রথমে অবধারিত ভাবে আজকের বোমা বিস্ফোরণের কথা এসেই পড়ে। দুর্লভের কাছ থেকে কবির ঘটনার পুরো বিবরণ শুনলেন। দুটো বোমা ফেটেছে, আরও দুটো বোমা রাখা ছিল কাছাকাছি। পুলিশ যথাসময়ে সে দুটি অকেজো করে দিয়েছে। সে দুটোও ফাটলে আরও অনেকের মৃত্যু হত।

কথার মাঝখানে কবির হঠাৎ বলে উঠলেন, দুর্লভ, তোমাকে একটা কথা জিগ্যেস করব? তুমি সত্যি উত্তর দেবে? আমি একজন মুসলমান। আজকের ঘটনাটাও কিছু-মুসলমানই ঘটিয়েছে। তাই আমার ওপরে ভেতরে-ভেতরে রাগ কিংবা ঘৃণা হচ্ছে না?

দুর্লভ খানিকটা অবাকচোখে চেয়ে থেকে বলল, স্যার, আপনি মুসলমান? আপনি একজন পুলিশ অফিসার, আমিও তাই। আমরা দুজনে একইরকম সার্ভিস রুল মানি, আমাদের তো আলাদা কোন জাত বা ধর্ম থাকে না!

কবির বললেন, তবু

তাকে বাধা দিয়ে দুর্লভ আবার বললন, যারা আজ বোমা ফাটিয়েছে, তারা শুধু মুসলমান নয়, তারা মৌলবাদী, উগ্রপন্থী। এরকম মৌলবাদী কোন ধর্মে নেই? ইহুদিদের মধ্যে নেই, হিন্দুদের মধ্যে নেই। এরা সবাই এক ধরনের অন্ধ দানব। আমার তো মনে হয়, মানুষের সভ্যতাই ধ্বংসের পথে চলেছে আর এই মৌলবাদীরা সেই ধ্বংসকেই এগিয়ে আনছে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে কবির বললেন, নাঃ, এরা শেষ পর্যন্ত সভ্যতাকে ধ্বংস করতে পারবে না।

গেলাশে একটা চুমুক দিয়ে তিনি বললেন, তুমি একটা নেবে? তুমি খাও কি?

দুর্লভ বলল, রেগুলার খাই না, মাঝে-মাঝে। কিন্তু হুইস্কি আমার সহ্য হয় না। কখনও পার্টি-ফার্টিতে রেড ওয়াইন খাই।

কবির বললেন, তা আমার কাছে নেই। ঠিক আছে, কাজের কথা হোক।

দুর্লভ বলল, আমাদের প্রধান কাজ দুটো। প্রথম হচ্ছে, শিউলাল ঝাঁকে খুঁজে বার করা। এই শিউলাল থানায় গিয়ে রিপোর্ট করেছিল। কিন্তু তার ঠিকানা কিংবা কাজের জায়গা সম্পর্কে কিছু জানায়নি। সে এখনও বেঁচে আছে কি না, তাও আমরা জানি না। আর সেকেন্ডলি, গীতা চাওলাকে জেরা করে জানতে হবে, আসল ঘটনাটা কী ঘটেছিল।

কবির জিগ্যেস করলেন, আমার একটা খটকা লাগছে। খুন হয়েছিল একটা, না দুটো? দুই বন্ধু এক বাইজির বাড়ি গিয়ে মদ্যপান করতে করতে নিজেদের মধ্যে ঝগড়া বাধিয়ে ফেলল। তারপর একজন গুলি করল আর একজনকে। ঘরে পড়ে রইল একজন, রিভলভার হাতে বেরিয়ে এলো আততায়ী, তার নাম সহদেব, ধুতি পরা, হাতে বালা। রাইট? গুলি করতে করতে সে সিঁড়ি দিয়ে নেমে পালাল। তখন কিছু জানাজানি হয়নি।

ছমাস বাদে সেই বাড়ি ভেঙে ফেলার সময় ভিত খুঁড়ে পাওয়া গেল একটা ডেডবডি। সেটা শিউলালের নয়, তোমরা আইডেন্টিফাই করেছ। সেটা ওই সহদেবের। সে খুন হল কখন, কোথায়? ও বাড়িতে তো শিউলালের খুন হওয়ার কথা আমরা জেনেছি।

না, স্যার। ঘটনার কয়েকদিন পর শিউলাল নিজে এসে থানায় খবর দিয়েছিল। সে তো খুন হয়নি?

ঘটনাটা যে মিলছে না। থানায় এসে যে খবর দিল, সে কি সত্যিই শিউলাল? নাকি অন্য কেউ শিউলাল বলে নিজের পরিচয় দিয়েছিল। তোমরাই তো বলছ, শিউলালের আর কোনও ট্রেস নেই।

অন্য কেউ এসে নিজেকে শিউলাল বলেছিল?

লজিক্যালি তাই তো মনে হয়।

তা হলে শিউলালের ডেডবডি গেল কোথায়?

বাড়ি ভাঙার সময় একটু ডেডবডি পাওয়া গেছে, এবার ভালো করে খুঁজে দেখো, আর একটা ডেডবডিও পাওয়া যায় কি না!

সে বাড়ি পুরোটাই ভাঙা হয়ে গেছে, সেখানে আর কিছু পাওয়া যায়নি, দ্যাট ইজ ফর শিওর!

কলকাতার মেয়ে লক্ষ্মীমণি, সে শুধু প্রথম খুনটাই দেখেছিল। সহদেবকে সে জ্যান্ত অবস্থায় পালাতে দেখেছে। এখন শিউলালের ডেডবডি যদি পাওয়া না যায়, তাহলে ও কেসটা এখন তোলা যায় না। লক্ষ্মীমণিকেও সাক্ষী হিসেবে ডেকে আনার দরকার নেই।

সেটা স্যার নির্ভর করছে, গীতা চাওলা শেষ পর্যন্ত কী বলে? সে যদি মুখ খুলতে না চায়, তা হলে সবাইকেই কোর্টে প্রোডিউস করতে হবে। লক্ষ্মমণিকেও বাদ দেওয়া যাবে না।

দুর্লভ, চতুর্দিকে অকারণে মানুষ মরছে। আর আমরা একটা অসহায় মেয়েকে বাঁচাবার চেষ্টা করছি। যদি কোনও কারণে–

স্যার, আইন আমাদের হাতে নেই। আমরা চেপে গেলেও আদালতে জজই বলবেন, সে বাড়িতে আর কে কে ছিল। অন্য সাক্ষী কোথায় গেল?

উঠে দাঁড়িয়ে সে বলল, আজ আমার একটু ব্যস্ততা আছে। গীতা চাওলার সঙ্গে আমি কাল সকালে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছি। সাড়ে দশটায়। আপনাকে আমি ঠিক পৌনে দশটার সময় এসে তুলে নিয়ে যাব। রেডি থাকবেন।

কলকাতার তুলনায় দিল্লিতে ভোর হয় একটু দেরিতে। এই সময়টায় বেশ কুয়াশা থাকে। কবির বুঝতেই পারেননি কত বেলা হয়ে গেছে। সব জানলার পরদা টানা। ঘুম ভাঙার পরেও একটুক্ষণ আলস্য করলেন কবির। তারপর বালিশের পাশে রাখা হাতঘড়িটা তুলে নিয়ে দেখেই ধড়মড় করে উঠে বসলেন।

আটটা চল্লিশ! প্রাতঃকৃত্য সারতে কবিরের অনেকটা সময় লাগে। টেলিফোনে চায়ের অর্ডার দিয়ে তিনি ছুটলেন বাথরুমে।

দিল্লিতে সকালের দিকে নানা রাস্তায় ট্রাফিক জ্যাম হয়, তবু দুর্লভ সিং একেবারে ঠিক সময়ে এসে উপস্থিত। কবিরও তখন টাইয়ের গিট বাঁধছেন।

গীতা চাওলার অ্যাপার্টমেন্ট বসন্তবিহারে একটা বাড়ির তিনতলায়। বেশ সুন্দরভাবে সাজানো। প্রশস্ত বসবার ঘর, তার মধ্যে আট-দশটা টবের গাছ। দু-দিকের দেওয়ালে পরপর কয়েকটি পাখির ছবি। আঁকা নয়, ফটোগ্রাফ।

গীতা চাওলার বয়েস ঠিক বোঝা যায় না। তিরিশ থেকে চল্লিশের মধ্যে। পাতলা, ছিপছিপে চেহারা, বেশ রূপসী, মুখে বুদ্ধি আর কিছুটা শিক্ষারও ছাপ আছে। রং ফরসা, ঠোঁটে গাঢ় লাল লিপস্টিক লাগানো। তার শালোয়ার-কামিজের রংও লাল।

পরিস্কার ইংরিজিতে সে বলল, প্লিজ কাম ইন। বসুন। আগেই জিগ্যেস করে নিচ্ছি, আপনারা চা না কফি খাবেন? আমি নিজে মাছের চপ বানিয়েছি, তাও খেতে হবে।

কবির বললেন, আমি ব্রেকফাস্ট খাওয়ার সময় পাইনি। মাছের চপ খেতে রাজি আছি, সঙ্গে চা খাব।

গীতা ওদের মুখোমুখি একটা সোফায় বসার পর দুর্লভ বলল, কলকাতা থেকে আমাদের একজন অফিসার এসেছেন। তিনি আগে আপনাকে কিছু প্রশ্ন করতে চান। আপনার আপত্তি নেই তো?

গীতা বলল, না, আপত্তি থাকবে কেন?

কবির বললেন, নমস্কার আমি প্রথমেই জানতে চাই, রাজেন্দ্রনগরের একটা বাড়িতে আপনি একসময় ছিলেন, তখন আপনার নাম কী ছিল? গীতা চাওলা?

না, তখন আমার নাম ছিল দিলরুবা।

দিলরুবা? আমি যে শুনেছি, আপনার নাম ছিল জানেমন বিবি?

তা হতেও পারে। আমি এক-এক সময় এক একটা নাম দিই। সারা জীবন ধরে একটাই নাম আমার মোটেই পছন্দ হয় না। এখন যে আমি গীতা চাওলা, এই নামটাও আমার আসল নাম নয়।

বাঃ! নতুন-নতুন নাম, এটা বেশ ভালো ব্যাপার। রাজেন্দ্রনগরের সেই বাড়িটায় একটা খুন হয়েছিল? একটা কিংবা দুটো। আপনি বলেছেন, আপনি সে সময় ও বাড়িতে ছিলেন না, আগেই ছেড়ে চলে গেছেন। এটা সত্যি?

দেখুন সাহেব, আমারা মা ছিলেন প্রফেশনাল বাইজি। লাখনউতে থাকতেন। আমিও তাই। লাখনউয়ের বদলে দিল্লিতেই এখন টাকা বেশি। নাম বদলের মতন, ঘনঘন বাড়ি বদল

করাও আমার শখ। রাজেন্দ্রনগরের ওই বাড়ি ছেড়ে আমি অনেক আগেই এখানে চলে এসেছি, তার অকাট্য প্রমাণ আছে। আমি যে দেড় বছর ধরে এই ফ্ল্যাটে থাকি, অনেক লোক তার সাক্ষী দেবে।

আমি যদি বলি, ওই খুনের সময় আপনি রাজেন্দ্রনগরেই ছিলেন, আর আপনার নাম তখন ছিল জানেমন বিবি?

আপনি বললেই তো হবে না।

যদি বলি, আমার কাছে তার প্রমাণ আছে?

কী প্রমাণ?

কবির কোটের পকেট থেকে একটা ফটোগ্রাফ বার করলেন। সেটা গীতার মুখের সামনে তুলে ধরে জিগ্যেস করলেন, আপনি একে চেনেন?

দু-এক পলক তাকিয়েই গীতা ঠোঁট উলটে বলল, না। কখনও দেখিনি।

ফটোগ্রাফটি আবার তুলে ধরে কবির বললেন, এর নাম লক্ষ্মীমণি। পশ্চিম বাংলার মেয়ে। কেউ কেউ একে সরিফন বিবি বলেও ভুল করেছে। এ মেয়েটি আপনার মেইড সারভেন্ট ছিল। এই মেয়েটি আর আপনি, দুজনেই খুনের সময়...ও বলেছে..

ঠোঁটে বিদ্রুপের হাসি ফুটিয়ে গীতা বলল, মেইড সারভেন্টদের মুখ আমি মনে রাখি না। এ পর্যন্ত কত মেয়েই তো আমার কাছে কাজ করেছে, তাদের কথা মনে রাখতে হবে নাকি! আপনাদের বাংলার কোনও মেয়ে আমার সম্পর্কে কী বলেছে না বলেছে, তাতে কিছু প্রমাণ হয় নাকি? আপনি একজন দায়িত্বশীল অফিসার হয়ে এ কী কথা বলছেন?

দুর্লভ এবার বললেন, মিস চাওলা, একটা খুনের ব্যাপারে আমরা এসেছি। আপনি সেই খুনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, এমন অভিযোগ আমরা করিনি। সত্যিই সেরকম ভাবিনি।

আমরা শুধু আপনার কাছে সাহায্য চাইতে এসেছি, যাতে খুনের রহস্যটা সন্ত করা যায়। আপনি যা দেখেছেন, সাক্ষী দেওয়ার সময় সেই কথা বলবেন।

মুখের হাসি মুছে ফেলে গীতা এবার জ্বলন্ত চোখে বলল, আমি কোর্টে গিয়ে সাক্ষী। দেব? সারা দুনিয়া জানবে যে আমি একটা বাইজি? আমার ঘরে মানুষ খুন হয়? নো! আমি যা বলেছি, তাতেই স্টিক করে থাকছি। আপনারা আমার নামে অ্যারেস্টের ওয়ারেন্ট আনতে পারবেন? আই চ্যালেঞ্জ ইউ!

বাকি দুজন একটুক্ষণ নীরব।

গীতা নিজেকে একটু সামলে নিয়ে বলল, নিন, চা খান। ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে।

এই সময় দরজায় কলিং বেল বাজল।

গীতা বাড়িতে এ সময় কোনও কাজের লোক রাখেনি। নিজেই উঠে গিয়ে খুলে দিল দরজা।

হাতে একগুচ্ছ গোলাপ নিয়ে ঢুকল শৌখিন চেহারার এক যুবক। পুরোদস্তুর ধূসর রঙের সুট পরা। মাথায় অনেক চুল। চোখে সানগ্লাস।

গীতা পুলিশ অফিসার দুজনের দিকে ফিরে বলল, ইনি আমার বিশেষ বন্ধু।

দুর্লভ একটু অস্বস্তির সঙ্গে বলল, আমরা একটা বিশেষ ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করছি। সেটা গোপন রাখতে চাই। আপনার বন্ধুকে একটু পরে আসতে বলবেন? কিংবা অন্য কোনও ঘরে যদি বসান।

যুবকটি বলল, তার চেয়ে আমার এখানে বসাই ভালো। আমি হয়তো আপনাদের অনেকটা সাহায্য করতে পারব।

গীতার পাশে বসে পড়ে সে প্রথমে গোলাপগুচ্ছ তার হাতে তুলে দিল। তারপর সানগ্লাসটা খুলে ফেলে অন্য দুজনের দিকে তাকিয়ে বলল, নমস্কার। আমার নাম শিউলাল ঝা।

ঘরের মধ্যে যেন একটা বোমা পড়ল।

কবির আর দুর্লভ স্তম্ভিতের মতন তাকালেন পরস্পরের দিকে।

দুর্লভ অস্ফুট স্বরে বলল, শিউলাল ঝা। আপনি..আপনি...এতদিন কোথায় ছিলেন?

শিউলাল হেসে বলল, কিছুদিন ছিলাম আগ্রায়, কিছুদিন চেন্নাই, এখন বহাল তবিয়তেই দিল্লিতে আছি।

দুর্লভ বলল, পুলিশ অনেক খুঁজেও আপনাকে পায়নি।

শিউলাল অবাক হয়ে বলল, পুলিশ আমাকে খুঁজবে কেন? আমি কি কোনও অপরাধ করেছি? না তো!

আপনার বন্ধু সহদেব আচারিয়া?

জি হ্যাঁ।

সে রাজেন্দ্রনগরের একটা বাড়িতে খুন হয়েছে। আপনি–

আমি তো তাকে খুন করিনি। আমিই থানায় গিয়ে তার খুনের কথা রিপোর্ট করেছিলাম। আপনারা তার ডেডবডি খুঁজে পেয়েছেন?

হ্যাঁ, পেয়েছি।

এতদিন পর? আমি আমার ডিউটি ঠিকই করেছিলাম। কোনও খুনের ঘটনা জানলে পুলিশকে জানাতে হয়, তাই না? আর তো আমার কোনও দায়িত্ব নেই?

সেই খুনের সময়, এই মেয়েটি, গীতা চাওলা, তখন ওর অন্য নাম ছিল, ওখানে উপস্থিত ছিল?

ছিল।

অ্যাঁ? ছিল? ও যে অনবরত বলছে, ওখানে ছিল না, খুনের ঘটনা কিছুই জানে না?

সে কথা বলেছিল, কারণ, ও চাইছিল, আপনারা যেন বারবার ওকে এই নিয়ে বিরক্ত না করেন। কাল রাত্তির থেকে আমি ওকে বোঝাচ্ছি, পুলিশের কাছে সবকথা খুলে না বললে পুলিশ পিছু ছাড়বে না। বারবার ফিরে-ফিরে আসবে। সেইজন্যই তো আজ আমি এই সময় চলে এলাম।

থ্যাঙ্ক ইউ। তা হলে আপনার কাছে আরও কিছু প্রশ্নের উত্তর পেতে পারি?

অবশ্যই পারেন। কিন্তু তার আগে আমি একটা কথা বলে নিই। সহদেবের খুনের ব্যাপারে আমি আর গীতা কোনওক্রমেই জড়িত নই। তবু পুলিশ যদি আমাদের জড়াবার চেষ্টা করে, সেজন্য আমরা আটঘাট সব বেঁধে রেখেছি। পুলিশ ইচ্ছে করলে যে-কোনও একটা কেস জড়িয়ে দিতে পারে। না, না, আপত্তি করবেন না। এরকম হয়, বিনা দোষে মানুষের ফাঁসিও হয়। তাই আমরা ব্যবস্থা করে রেখেছি, প্রমাণ করে দেব সেই সময় গীতা ও বাড়িতে ছিল না, আমিও ছিলাম না। আমার আসল নাম বসন্তকুমার, আমার স্কুল সার্টিফিকেটেও এই নাম আছে, শিউলাল আমার ডাক নাম। বসন্তকুমার সেই সময় আগ্রায় দেশের বাড়িতে ছিল, তাও প্রমাণ করে দেব!

দুর্লভ বলল, আপনারা ইনভলভড না থাকলে পুলিশ আপনাদের টাচ করবে না, এ বিষয়ে আমি কথা দিচ্ছি। ওয়ার্ড অফ অনার।

বেশ। তা হলে কী জিগ্যেস করবেন, করুন।

দুর্লভ এবার কবিরের দিকে ফিরে বলল, সার, নাও ইট ইজ ইয়োর টার্ন।

কবির বললেন, আপনি আর সহদেব, দুই বন্ধু, খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন?

জি হাঁ, ক্লোজ ফ্রেন্ড।

সমান সমান বন্ধুত্ব? নাকি একজন বস আর অন্যজন তার তাঁবেদার? কে বেশি পয়সা খরচ করত?

আপনি ঠিক ধরেছেন, সেই দিক দিয়ে সমান সমান বন্ধুত্ব নয়। সহদেব খুব বড়লোকের। ছেলে, হাতে প্রচুর পয়সা। সেদিক থেকে তখনও আমি কমজোরি ছিলাম। আমার বাবার মৃত্যু হয়েছিল কিন্তু আমি সম্পত্তির ভাগ পাইনি। মামলা চলছিল। এখন মিটে গেছে। এখন ভাগ পেয়েছি। যাই হোক, সহদেবের পাল্লায় পড়ে আমিও প্রচুর মদ খেতাম, মেয়েমানুষের বাড়ি যেতাম। সহদেবই খরচ করত বেশি।

সহদেব কীরকম মানুষ ছিল? বুদ্ধিমান না মাথা মোটা? গোঁয়ার? গানবাজনা বুঝত?

সহদেব এমনিতে ভালো মানুষ ছিল। খুব একটা বুদ্ধি ছিল না। তবে বেশি মেদ খেলে একেবারে পাগল হয়ে যেত। কিছুতেই নিজেকে সামলাতে পারত না। লোকের সঙ্গেও খুব খারাপ ব্যবহার করত। যেন অন্য মানুষ। যেভাবে ও চলছিল, তাতে খুন না হলেও যে কোনওদিন ও অ্যাকসিডেন্টে মারা যেতে পারত। সেরকম অবস্থায় দু-একবার আমি ওকে বাঁচিয়েছি।

ওকে খুন করল কে?

গীতা খুন করেনি, আমি তার সাক্ষী। আমি খুন করিনি, গীতা তার সাক্ষী। এবং এটা হ্যাঁন্ড্রেড পারসেন্ট সত্যি।

আমি এখনও একটা ধাঁধার উত্তর পাচ্ছি না। ও বাড়িতে একজন মেইড সারভেন্ট ছিল, সে জানিয়েছে যে এই গীতার ঘরে সহদেব তার এক বন্ধুকে গুলি করে মেরে ফেলে।

তারপর নিজে রিভলভার হাতে নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে থাকে। তা হলে সেদিন কি আপনার বদলে অন্য কোনও বন্ধু ছিল ওর সঙ্গে?

না। আমিই ছিলাম। একজন মেড সারভেন্ট বলেছে এ কথা? গুড! গুড, গুড, গুড! তার মানে তো প্রমাণ হয়েই গেল, সহদেব জ্যান্ত অবস্থায় সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেছে। ওর খুনের ব্যাপারে আমার কোনও হাত থাকতে পারে না। সহদেব আমাকেই গুলি করেছিল। কিন্তু আমি মরিনি। আহত হয়েছিলাম, তাও খুব বেশি না।

আপনাকে গুলি করল কেন?

বলব? সেটা খুব নোংরা ব্যাপার। অবশ্য আপনারা ভেটারান পুলিশ, আপনাদের নিশ্চয়ই। এসব শোনা বা দেখার অভ্যেস আছে।

গীতার দিকে তাকিয়ে সে জিগ্যেস করল, কী বলব?

গীতা একটুখানি কাঁধ ঝাঁকিয়ে উত্তর দিল, আমার কিছু আসে যায় না।

শিউলাল বা বসন্তকুমার বলল, সংক্ষেপে জানাচ্ছি। সেদিন বেশি মদ খেতে-খেতে সহদেব পাগল হয়ে গেল। গীতার এক মেইড সারভেন্ট, সে বোধহয় বাংগালি ছিল, মাঝে-মাঝে ঘরে এসে আমাদের নাস্তা, পানি, কাবাব-টাবাব সার্ভ করে যাচ্ছিল। রোজই করে। তাকে দেখতে এমন কিছু ভালো নয়, তবে ফিগারটা বেশ টাইট। সহদেবের মাথায় হঠাৎ ভূত চাপল। সে ওই মেয়েটিকে বলল, তুই আজ শাড়ি-টাড়ি সব খুলে ফেলে সার্ভ কর। সে তো কিছুতেই রাজি নয়। বাংগালি মেয়েদের লজ্জা বেশি হয়, সে এতখানি জিভ বার করে বলতে লাগল, ও মা, ছি ছি, না, সে আমি পারব না। সহদেব বলল, কেন পারবি না? এই নে টাকা, কত টাকা চাস। পকেট থেকে সে মুঠো মুঠো টাকা বার করে ছুঁড়ে দিতে লাগল। মেয়েটা কিছুতেই রাজি নয়। সে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে লাগল, আর সহদেব জোর করে তাকে ধরে আনতে লাগল। মেয়েটা নিজের শাড়ি চেপে ধরে কান্না শুরু করে দিল। আমি তখন বিরক্ত হয়ে সহদেবকে বললাম, আর ছোড় না ইয়ার। ও

মেয়েটাকে জোর করছিস কেন? ও চলে যাক, গীতা না হয় পোশাক-টোশাক সব খুলে বসবে। গীতার অত লজ্জা-টজ্জা নেই। তখন সহদেব আবার বলল, না, ও মেয়েটা যাবে না। গীতা আর ও দুজনেই সবকিছু খুলে বসবে। গীতা আবার তাতে রাজি নয়। মেড সারভেন্টের সামনে সে কাপড় উল্লাবে কেন? যে-যাই কাজ করুক, সবারই তো একটা ডিগনিটি আছে। টাকা দিয়ে সবকিছু কেনা যায় না। সহদেব দুজনেরই কাপড় ধরে টানাটানি করছে আর চিৎকার করছে ষাঁড়ের মতন, আমার আর সহ্য হল না। আমি খুব জোরে একটা থাপ্পড় কষালাম সহদেবকে। সেই থাপ্পড় খেয়ে সহদেব কাজের মেয়েটাকে ছেড়ে দিল, সে দৌড়ে পালাল। আমার দিকে চেয়ে হিংস্রভাবে দাঁত বার করে সহদেব বলল, তুই আমার গায়ে হাত তুললি? তোর এত সাহস, কুত্তার বাচ্চা...। আমি বললাম, সহদেব মাথা ঠান্ডা কর। একটু চুপ করে বোস। সহদেব যে সঙ্গে রিভলভার নিয়ে এসেছে, আমি জানতাম না। অন্যদিন আনে না। হঠাৎ ফস করে একটা রিভলভার বার করে গুলি চালিয়ে দিল আমার দিকে।

দুর্লভ বলল, তখন কেউ ওর মাথায় একটা কাচের বোতল নিয়ে মারল?

শিউলাল বলল, নো! কেউ মারেনি।

কবির বললেন, তারপরও তো সহদেব সিঁড়ি দিয়ে নেমেছে, তখন ওর মাথায় তো কোনও ক্ষত ছিল না। গুলিটা আপনার কোথায় লেগেছিল?

কাঁধে! একেবারে গলা ঘেঁষে। আর ডান দিকে লাগলেই আমার গলাটা ফুটো হয়ে যেত। লাগেনি, বিশেষ কিছু হয়নি। পরে কয়েকদিন আমি গলায় একটা মাফলার জড়িয়ে ঘুরেছি। সেদিন গুলিটা লাগার পরেই আমি মাটিতে হুমড়ি খেয়ে মড়ার মতো পড়ে রইলাম। নড়াচড়া করলেই ও আবার গুলি করত। আমার কাঁধ দিয়ে গলগল করে রক্ত বেরুচ্ছে আর গীতা ভয়ে চাঁচাচ্ছে। সহদেব খানিকটা ভয় পেয়ে দৌড়ে বেরিয়ে গেল। দেয়ার এন্ডস মাই স্টোরি।

দুর্লভ বলল, তা হলে সহদেবকে খুন করল কে? তাকে অন্য কোথাও খুন করে ওই বাড়িতে এনে পুঁতে দেওয়া হয়েছিল?

উহুঃ!

বাকিটা যে মিস্ট্রি রয়ে গেল?

সহদেব সেই রাতেই খুন হয়েছিল। কে খুন করেছে, তাও আমরা জানি। কিন্তু অন্য কারুকে ধরিয়ে দেওয়া আমাদের উচিত নয়। এবার আপনারা খুঁজে দেখুন। মোট কথা, গীতা কিংবা আমি কিংবা ওই বাংগালি মেইড সারভেন্ট, আমরা কেউই ওকে খুন করিনি।

এইবার গীতা বলল, পুলিশ শত চেষ্টা করলেও আসল খুনিকে ধরতে পারবে না। সুতরাং, এখন বাকি গল্পটা বলে দেওয়া যেতে পারে।

দুর্লভ বলল, পুলিশ কিন্তু শেষ পর্যন্ত অনেক কিছুই পারে।

গীতা বলল, দেখুন চেষ্টা করে। আমরা নাম বলে দিচ্ছি।

শিউলাল বলল, সে রাত্তিরেই আমি আর গীতা ওবাড়ি থেকে হাওয়া হয়ে যাই। অন্যান্য ঘরের মেয়েরাও ভেঙ্গে পড়ে। খুনের ব্যাপারটা আমরা চোখে দেখিনি, কিন্তু জানি। খুন না। বলে এটাকেই ন্যায় বিচার বলা উচিত। ও বাড়িতে নেপালি দারোয়ান ছিল। তাদের একজনের নাম বাহাদুর। পুরো নাম জানি না। খুব বড়সড় চেহারা, তেমনি গায়ের জোর। অসম্ভব বিশ্বাসী। এমনিতে মানুষটা শান্ত, কিন্তু বদরাগী। একবার রাগ হলে হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। সরিফন বলে একজন মেইড সারভেন্টের সঙ্গে ওর ঘনিষ্ঠতা ছিল। সহদেব সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে বাইরে। বেরুবার গেট খুঁজে পায়নি। বদ্ধ মাতাল তো। হাতে রিভলভার, এলোমেলো গুলি চালাচ্ছে। নীচের সবাই আড়ালে লুকিয়ে পড়েছে। তবু একটা গুলি লাগে সরিফনের পায়ে। তখন একটা বাঘের মতন বাহাদুর আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে একটা বোতল দিয়ে মারে সহদেবের মাথায়। সহদেব তাকে মারার জন্যও

রিভলভার তুলেছিল, আর সুযোগ পায়নি। বাহাদুরের বোতলের আঘাতটা একটু জোরেই হয়ে গিয়েছিল। সেই এক আঘাতেই সহদেব খতম। আপনারাই বলুন, বাহাদুর কি কিছু অন্যায় করেছে?

দুর্লভ ব্যাজার মুখে বলল, সে বিচারের ভার আমাদের ওপর নয়।

শিউলাল বলল, সহদেবের ডেডবডির ব্যবস্থা বাহাদুর একাই করেছে। পুলিশ যাতে সঙ্গে সঙ্গে খুঁজে না পায়, তার জন্য মেঝেতে গর্ত করে তার মধ্যে লাশটাকে কবর দিয়ে তার ওপর। খাঁটিয়া পেতে সরিফনকে শুইয়ে রেখেছিল। তারপর সরিফনকে নিয়ে সে কোথায় চলে গেছে, জানি না। সত্যিই জানি না। খুব সম্ভবত নেপালে চলে গেছে। নেপাল থেকে তাকে খুঁজে বার করতে পারেন তো দেখুন।

কবিরের দিকে তাকিয়ে দুর্লভ বলল, এবার সম্ভবত কেসটা ড্রপ করতেই হবে।

কবির বললেন, আমরা চেষ্টার কোনও ত্রুটি করিনি। কিন্তু এই কেসে কারুকে শাস্তি দেওয়া আর বোধহয় সম্ভব নয়। আমি এটা ভুলে যেতেই চাই।

২. ৫

এয়ারপোর্টে এসে কবির দেখলেন, সেই একই ফ্লাইটে ফিরছেন বিনায়ক।

সিকিউরিটি চেকের পর বিমানে ওঠার অপেক্ষায় পাশাপাশি বসলেন দুজনে। বিনায়ক জিগ্যেস করলেন, কী, দিল্লি জয় করা হল?

কবির ঘাড় নাড়লেন।

বিনায়ক বললেন, তাই তোমাকে খুশি-খুশি দেখাচ্ছে। তোমরা পুলিশরা শুধু জয় করেই খুশি হও। পরাজয়েও যে অনেক সময় সুখ থাকে, তা তোমরা বুঝবে না। অনেকটা

দুর্যোধনের মতন। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, সুখ চাহি নাই মহারাজ, জয় চেয়েছিনু, জয়ী আমি আজ। পড়েছ?

কবির বললেন, না পড়িনি, তবে আবৃত্তি শুনেছি। কর্ণ-কুন্তী সংবাদ, তাই না?

ধ্যাৎ! এর মধ্যে কর্ণ এল কোথা থেকে! সে তো হারা পার্টি। এটার নাম গান্ধারীর আবেদন! একদিন আমি পড়ে শোনাব তোমায়।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, এটাও আমি শুনেছি। নামটা মনে ছিল না। তবু, তুমি একদিন পড়ে শুনিয়ো।

তুমি আমাকে কী একটা গল্প শোনাবে বলছিলে?

সেই গল্পের শেষটা ঠিক করার জন্যই আমি এবার দিল্লিতে এসেছিলাম। আমরা সাধারণত কোনও অপরাধীকে গ্রেফতার করতে পারলেই খুশি হই। এবার এসেছিলাম, যাতে একজনকে গ্রেফতার করতে না হয়। এটাকে তুমি জয় বলবে, পরাজয় বলবে?

হেঁয়ালি করো না। পুরো ব্যাপারটা খুলে বলো।

ও হ্যাঁ হ্যাঁ। তুমি বলছিলে বটে, আবার তাকে নিয়ে কী গণ্ডগোল শুরু হয়েছে? তোমরা কি একটা নিরীহ মেয়েকে নিজের মতন করে বাঁচতে দেবে না?

শোনো বিনায়ক। তাকে বাঁচাবার জন্যই তো এত সব চেষ্টা। তবু ঘটনাটা আমাদের সাধ্যের বাইরে চলে যেতে পারত। এর মধ্যে যা হয়েছে, তা তোমাকেও জানাইনি। বাচ্চা মেয়েদের স্কুলে চাকরি, একটু জানাজানি হলেই তার চাকরি নিয়ে টানাটানি হত। কিন্তু সেই খুনের মামলাটা আবার উঠেছিল। তাতে লক্ষ্মীমণি একজন প্রত্যক্ষ সাক্ষী। দিল্লি পুলিশ তাকে আনতে চাইলে আমরা বাধা দেব কী করে? আইন হচ্ছে আইন। কিন্তু...।

কবির এরপর বিনায়ককে বাকি ঘটনা খুলে বললেন।

সব শুনে বিনায়ক বললেন, আমি কুকুরদের ভালোবাসি। কেউ যদি কোনও কুকুরের অযত্ন করে, তা হলে আমার খুব রাগ হয়। কিন্তু একটা কুকুর যদি পাগল হয়ে যায়, তাকে মেরে ফেলা ছাড়া আর তো কোনও উপায় থাকে না। এই সহদেব লোকটাও তো পাগলা কুকুরের মতন হয়ে গিয়েছিল। ওকে মারা হয়েছে, বেশ হয়েছে। তার জন্য সমাজ ওই বাহাদুর নামের দারোয়ানটিকে কোনও শাস্তি দিতে পারে না। বরং তাকে পুরস্কার দেওয়া উচিত।

কবির বললেন, আইনে যে সেরকম কোনও ব্যবস্থা নেই। যাই হোক, এ কেস নিয়ে আর আমাদের কিছু করার নেই। আমরা হাত ধুয়ে ফেলেছি। লক্ষ্মীমণিকে নিয়ে যে আবার এত কাণ্ড হয়েছে, তাও ওকে জানাবার দরকার নেই।

কলকাতায় পৌঁছে দুই বন্ধু তক্ষুনি বাড়ি না ফিরে সোজা চলে এলেন একটা ক্লাবে। আজ সেলিব্রেট করতেই হবে।

সেখান থেকেই ফোন করা হল বর্ধনকে। মোবাইল ফোন নিঃশব্দ। পাওয়া গেল বাড়ির ফোনে।

তিনি প্রথমেই বললেন, আমার মোবাইলটা চুরি হয়ে গেছে আজ বিকেলে। এত চোর বেড়েছে! হ্যাঁ, কী বলবে, বলো! তুমি কোথায়, দিল্লিতে?

কবির বললেন, না স্যার, একটু আগে ফিরেছি।

খুনি ধরা পড়েছে?

না, তবে

ধরতে পারলে না। তা হলে আর শুধু তবে শুনে কী হবে? তবু বলো–

সবটা শোনার পর বর্ধন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, আমাদের লাইনে কাজ হচ্ছে চোর, খুনি ডাকাতদের ধরে ধরে শাস্তি দেওয়া। এরকম একজন-দুজনকে যদি সুস্থ জীবন ফিরিয়ে দেওয়া যায় তার চেয়ে আনন্দের আর কী হতে পারে! তবে এসব ঘটনা ঢাকঢোল পিটিয়ে তো কাউকে জানানোও যায় না।

জানাবার দরকারও নেই।

ঠিক। মেয়েটি শান্তিতে থাকুক। কবির, তোমার কবে কী প্রমোশন হবে আমি জানি না। আমার একটা সোনার রিস্ট ওয়াচ আছে, একবার পরীক্ষায় ফার্স্ট হয়েছিলাম বলে আমার বাবা দিয়েছিলেন। ঘড়ি তো আমি এখন পার না। ওই ঘড়িটা তোমায় নিতে হবে।

স্যার, আমি আর ঘড়ি নিয়ে কী করব। আমার তো দুটো ঘড়ি আছেই। আপনি যে বললেন, সেইটি আমার কাছে অনেকখানি পাওনা।

চোপ! আমি বলছি, নিতেই হবে। তুমি না পরো, তোমার ছেলেকে দিও!

.

এই কাহিনির এমন মধুর সমাপ্তি হলে সবাই খুশি হত। কিন্তু জীবন মসৃণ গতিতে চলে না সব সময়।

লক্ষ্মীমণির জীবনে আবার একটা খাঁড়া নেমে এল।

বাচ্চাদের স্কুল থেকে তাকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। অভিযোগ গুরুতর।

রাত্তিরবেলা লক্ষ্মীমণি একা থাকে নীচের তলায়। আর থাকে স্কুলের দারোয়ান রামদয়াল। সে লোকটা গাঁজাখোর। মাঝে-মাঝেই লক্ষ্মমণির রান্নায় ভাগ বসাতে চায়। এক রাত্তিরে সে জোর করে লক্ষ্মীমণির ঘরে ঢুকে পড়ে তাকে বলাৎকার করতে গিয়েছিল। লক্ষ্মীমণি ভয় পেয়ে চ্যাঁচামেচি করতেই ওপরতলায় বাড়ির মালিক বুড়ো-বুড়ির ঘুম ভেঙে যায়।

তারা দাবি করেছেন, লক্ষ্মীমণি আর দারোয়ান, দুজনকেই বিদায় করে দিতে হবে। একদিনও আর রাখা চলবে না। সে ব্যবস্থা না নিলে তারা ইস্কুলই বন্ধ করে দেবেন।

লক্ষ্মীমণির চাকরি গেছে, দারোয়ান পলাতক।

এখন কোথায় যাবে লক্ষ্মীমণি? আপাতত বিনায়কের স্ত্রী তাকে নিজের বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছে। কিন্তু স্কুল কর্তৃপক্ষ সেটাও ভালো নজরে দেখছে না। বিনায়কের কাছ থেকে ফোনে এই খবর শুনে কবির কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন।

আবার কোনও বেশ্যালয়েই যেতে হবে লক্ষ্মীমণিকে। এ দেশের মেয়েরা একবার যদি ঘর ছাড়ে কিংবা নিজের ঘর থেকে জোর করে বাইরে বার করে দেওয়া হয়, তারা আর স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে পারে না। তাদের শেষ পর্যন্ত গতি হয় মাংসের বাজারে।

একটু পরে একটা বিশেষ কাজে বর্ধন এলেন কবিরের অফিসে।

কাজের কথা শুরু করার আগে কবির তাঁকে শোনালেন ঘটনাটা।

বর্ধন বললেন, হু। এখন সে যাবে কোথায়?

কবির বললেন, আমার বন্ধু বিনায়কের বাড়িতে দুজন কাজের লোক আছে। আর একজনকে রাখবে কী করে? লেখক মানুষ, কতই বা রোজগার। তা ছাড়া ওঁর স্ত্রীর ইস্কুল থেকেও আপত্তি করছে। এরপর আমাদের তো আর কিছু করার নেই, স্যার।

বর্ধন কয়েকবার মাথা দোলালেন।

তারপর বললেন, কবির, আমার বাড়িতে যেদিন মেয়েটিকে নিয়ে যাওয়া হয়, সেদিন একটা কাচের জার আমি ভেঙে ফেলেছিলাম মনে আছে? ওই মেয়েটা যেমন নিখুঁত ভাবে কাঁচ পরিষ্কার করে জলটল মুছে ফেলল, কোনও কাজের মেয়েই তা করে না। তার মানে, ওর। কাজে মন আছে। আমার বাড়িতে যে হাউজকিপার, তার বয়েস হয়েছে, সব কাজ

আর পারে না। ওই মেয়েটা, কী যেন নাম বললে, সরস্বতী না দুর্গা, ওকে আমার বাড়িতে রাখতে পারি। কী, সেটা ঠিক হবে না?

এ তো খুবই ভালো কথা স্যার।

ওকে আজই নিয়ে আসার ব্যবস্থা করো। ওর দুটো ছেলেমেয়ে আছে না? তাদেরও আনাও। ওরাও থাকবে, লেখাপড়া শেখার ব্যবস্থা করব। আমি শিগগির রিটায়ার করব, ওদের নিয়েই আমার দিন কাটবে।

এরপর একটা সিগারেট ধরাতে গিয়ে তিনি আবার বললেন, তবে হ্যাঁ, ওর স্বামীটা যেন আমার বাড়ির ধারে কাছেও না আসে, বলে দিও। যদি আসে, তাকে আমি জুতোপেটা করব।

কবির ঝুঁকে পড়ে বর্ধনের হাঁটু স্পর্শ করলেন।